# পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

## লেখকের অন্যান্য রচনা

চিত্রবহ্—অভিনব অপরূপ উপন্যাস। বহুল আলোচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ৪০০ পৃষ্ঠা।

জাপান—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। অসংখ্য ছবি। বহুবর্ণ চিত্রিত প্রচ্ছদ।

আলুপোড়া—ছোটদের সচিত্র গল্পের বই।

হানাসি—উৎকৃষ্ট জাপানী ছোট গল্পের বই।

নামিকো—আধুনিক জাপানের প্রসিদ্ধ গার্হস্থ্য উপন্যাসের অনুবাদ।

বনস্পতির অভিশাপ—প্রাচীন জাপানের রোমান্টিক উপন্যাস অবলম্বনে বিরচিত।

চিত্রগ্রীব—ছোটদের চমৎকার সচিত্র উপন্যাস। অনুবাদ।

# পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্
কলিকাতা

দাম—১৲

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা



জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

কালিকা প্রেস
২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা
শ্রীক্ষেত্রমোহন দালাল কর্তৃক মুদ্রিত

"পোর্ট-আর্থারের কথা" 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিণাম পোর্ট-আর্থার বিজয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পোর্ট-আর্থারে জাপানী ও রুশ, উভয় পক্ষই অমিতবিক্রমে জীবন পণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—তাই এই যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। সেই দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অধিকারের জন্য যে-সব জাপানী যুদ্ধ করিয়াছিল লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই তাদেরি একজন। ডান হাতখানি যুদ্ধে বিসর্জ্জন দিয়া বাঁ হাতে তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। আধুনিক যুগের যুদ্ধের সেই প্রোজ্জ্বল চিত্র—জাপানীর শৌর্য্যবীর্য্য, দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব আত্মদানের নিগূঢ় পরিচয়—বাঙালী পাঠককে উপহার দিলাম।

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট রচনা করিয়া ইহার সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—অনুবাদক।

# অনুশোচনা

( পোর্ট- আর্থার-বিজয়ী জেনারেল নোগি বিরচিত

ঘুসির বদলে ঘুসি দিতে গেল
যুদ্ধে জাপানী সেনা,
ময়দানে আর কেল্লায় হ'ল
গোলাগুলি লেনা দেনা ;
বিজয়ী জাপান ; তবু, জয়গান
গাহে না তেমন কেহ,
ভরি ময়দান পাহাড়-প্রমাণ
পড়ে' আছে মৃতদেহ।
শুধু মৃতদেহ,—শুধু মুমূর্ষু,—
পাহাড়-প্রমাণ দুখ ;
পাহাড়-সমান দুঃখের ভারে
ভেঙেছে আমার বুক।

ভাবিতেছি শুধু স্বদেশে ফিরিয়া
মন যে কেমন হবে ;—
ফিরিল না যারা তাদের বারতা
সকলে সুধাবে যবে !
দুখে দুখে যারা দিন কাটায়েছে
পাকায়েছে চুল দাড়ি,—
ক্ষীণ আশা লয়ে আছে পথ চেয়ে,—
তারা এসে তাড়াতাড়ি
সুধালে বারতা,—কী দিব জবাব ?—
গেছে—সব গেছে মারা,
কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

# সোভিয়েট-আর্থারের ক্ষুধা

## আহ্বান

যুদ্ধযাত্রার আদেশ যখন পৌঁছিল তখন বসন্তকাল, চেরিগাছে ফুল ফুটিতে সুরু করিয়াছে। ভাবিতেছি, সত্যই কি এবার আমাদের অধীর প্রতীক্ষার অবসান হইল? খবরটা এতই ভাল যে বিশ্বাস করিতে ভয় করে!

এ দলের পতাকা বহন করা আমার কাজ। নায়ককে বলিলাম, কর্নেল! আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন! এই মাত্র হুকুম পেয়েছি! কর্নেলের মুখে আনন্দের হাসি, কহিলেন, হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত এসেছে! আশা ছিল না, কি বলো?

এমন সুখের দিন আর কখনো আসিয়াছিল কি?—কই মনে ত পড়ে না! ফুর্ত্তির চোটে কি করি কোথা যাই কিছুই ঠিক করিতে পারি না, ছুটাছুটি করিয়া জনে জনে খবরটা শুনাইয়া বেড়াই। সকলের অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া যেন একটা অদ্ভুত তড়িৎপ্রবাহ বহিতে সুরু করিল—তার ফলে কি নায়ক কি সৈনিক, প্রত্যেকের মনে হইতে লাগিল, যেন সে একাই গোটা রুশিয়া দেশটার সঙ্গে লড়িতে পারে!

প্রথম ও দ্বিতীয় 'রিজার্ভ'-দলের লোকও অবিলম্বে নিজ নিজ পতাকাতলে জড়ো হইতে লাগিল। তাদের মধ্যে এমন সব গরীবও ছিল যারা যুদ্ধে গেলে তাদের পরিবারের অনাহারে থাকার সম্ভাবনা; কেউ বা স্থবির রুগ্ন বাপ-মাকে ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছে—যুদ্ধযাত্রায়

বাধা দিবার মত চিন্তা ও উদ্বেগ সকলেরই ছিল, কিন্তু "দেশের এই সঙ্কটকালে সাহস ও নিষ্ঠার সহিত দেশসেবা করিতে হইবে"—স্বজাতির জন্য প্রাণ দিতে পারা যে কত বড় সৌভাগ্য সকলে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

নাকামুরা প্রথম 'রিজার্ভ'-দলের সৈনিক। তার ঘরে পীড়িতা স্ত্রী ও বছর তিনেকের এক শিশু। নিঃস্বের সংসার, কায়ক্লেশে দিন কাটে; পতির যুদ্ধযাত্রার আগের দিন দীনহীন অস্থিসার মেয়েটি তার স্বল্পাবশেষ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সহরতলী থেকে পোয়া দেড়েক চাল ও এক পয়সার জ্বালানি কাঠ কিনিয়া আনিল। পতির জীবনে যুদ্ধযাত্রার মহাসুযোগ উপস্থিত, বিদায়-ভোজের আয়োজন না করিলে মানায় কি? পত্নী মৃত্যুশয্যায়, শিশু অনাহারে অবসন্ন, পতি চলিয়াছে দেশের জন্য প্রাণ দিতে!

প্রথম ও দ্বিতীয় 'রিজার্ভ'-এর লোকেরা যথাসময়ে সৈন্যাবাসে পৌঁছিল। দুর্ব্বলতা বা ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য যারা বাতিল হইল, তাদের দুঃখ ও নিরাশার আর অন্ত নাই। তারা কাকুতি-মিনতি জুড়িয়া দিল—"দয়া ক'রে কোনোরকমে আমায় নিতে পারেন না কি? দেখুন, গ্রাম থেকে আসার সময় তারা ভারি সমারোহে বিদায় দিয়েছে, ট্রেন ছাড়ার সময় বার বার জয়ধ্বনি ক'রে কত আনন্দ প্রকাশ করেছে। সঙ্কল্প ক'রে এসেছি, ঘরে আর ফিরবো না! এখন উপায়? কেমন ক'রে ফিরি বলুন? তারা যে ভাববে আমি একটা অকেজো অপদার্থ—সে অপমান কি ক'রে সহ্য করবো? দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে নিন—দোহাই আপনার, দয়া করুন—আমায় ফেরাবেন না!"

কাননজি বৌদ্ধমন্দিরে জনকয় লোক যুদ্ধযাত্রার অপেক্ষায় বাস

করিতেছিল। স্থির ছিল, এ দলে তারা যাইবে না, ডাক আসিলে পরে যাইবে। মিয়াতাকে তাদেরি একজন—দেহে মনে বেশ সুস্থ সবল। ঘর থেকে বিদায়ের সময় পণ করিয়া আসিয়াছে প্রথম দলের সঙ্গেই যুদ্ধে যাইবে! অথচ এমনি দুর্ভাগ্য, যুদ্ধে প্রাণদানের বদলে দেশের মধ্যেই নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা ধার্য্য হইল! কবে পাঠাইবে তারও ঠিকানা নাই। এ কি সহ্য হয়—মনে হইল মৃত্যুই তার পক্ষে শ্রেয়!

একদিন, তখন অনেক রাত, মিয়াতাকের বন্ধুরা গভীর ঘুমে অচেতন। নিরিবিলি সে একখানি বিদায়লিপি রচনা করিতে বসিল। তাহাতে লিখিল—কত সৈনিক যুদ্ধে গেল, দুর্ভাগা আমি এখনো প'ড়ে আছি—এ দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা নেই! কত সাধ্যসাধনা করেছি কেউ আমাকে সঙ্গে নিলে না! আমার রাজভক্তি ও দেশপ্রীতি মরে' প্রমাণ করা ছাড়া ত উপায় দেখি না!...

মৃত্যুর জন্য তৈরি হইয়া সাদা কাঠের খাপ থেকে সে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিল, তারপর সম্রাটের উদ্দেশে চাপাগলায় 'বান্‌জাই' বলিয়া 'হারাকিরি' করিল—অর্থাৎ তলপেটের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল! পুরানো দেবালয়ের নিভৃত নির্জ্জন প্রান্তে এই ভয়ানক কাণ্ড কেহ দেখিতেও পাইল না, কেহ জানিতেও পারিল না। বাহিরে তখন মৃদু বর্ষণের ঝির্‌ঝির্ শব্দ—আর কোনো শব্দ নাই।

দেশভক্ত সৈনিকের নিষ্ঠা বোধ করি বিধাতার বুকে বাজিল—হঠাৎ বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় তার প্রাণরক্ষা হইল। শেষে একদিন তার সাধও পূর্ণ হইল—সে হাসপাতাল ছাড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করিল!

লড়াই চলিতেছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়ের খবরে মন অবশ্যই খুসি হয়, তবুও স্বীকার করা ভাল, আনন্দটি নিছক্ আনন্দ নয়। ভারি—

এইভাবে চলিলে আমরা যখন পৌঁছিব, তখন হয় ত যুদ্ধ চুকিয়া যাইবে! দিন কয় পরে না কি অপর একটি দল যাত্রা করিবে—আমাদের পালা কখন? এখানে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি, ওদিকে উহারা লড়াই ফতে করিয়া বসিল যে! আরও বিলম্বে সেখানে গিয়া করিব কি?

যাক, শেষ পর্য্যন্ত হুকুম আসিয়াছে—ভোর ছয়টায় 'প্যারেড'-মাঠে সকলে জড়ো হইবে! অসীম আনন্দ—এতদিনে জীবনে মহোচ্চ কীর্ত্তির সুযোগ মিলিল! কথায় বলে, সাহসীর চোখে অবশ্য অশ্রু আছে, কিন্তু বিদায়কালে সে অশ্রু বর্ষণ করে না! ভালমন্দ সব কিছুর জন্য তৈরি বলিয়াই ত আমরা এ বিদায়কে চিরবিদায় না ভাবিয়া পারি না। মন কঠিন করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়াছি, তবু অন্তরের অশ্রু কেমন করিয়া নিরোধ করিব?

যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রি। উলটিয়া পালটিয়া বন্ধুবান্ধবের ছবিগুলি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। পরে ডেস্কের টানার মধ্যে দরকারি কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিলাম—যেন আমি মরিলে আমার বিষয়-ব্যবস্থার জন্য কাহাকেও বেগ পাইতে না হয়। তারপর স্বচ্ছন্দমনে মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাড়িতে সেই শেষ নিদ্রা!

রাত তিনটায় পুরানো কেল্লায় গিরিশীর্ষ হইতে তিন বার কামান গর্জ্জন করিল। মুহূর্ত্তে শয্যা ছাড়িয়া নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া সৈনিকের বেশে সাজিলাম। তারপর যে দিকে আমাদের মহামহিম সম্রাট বিরাজিত, সেই পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া মাথা নত করিলাম। 'মিকাদো'র যুদ্ধ-ঘোষণা-পত্র শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়া তাঁর উদ্দেশে কহিলাম—আমি আপনার নগণ্য অধম প্রজা, এইমাত্র যুদ্ধযাত্রা করছি! বাস্তুপীঠের সামনে অন্তিম আরাধনা করার সময় সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল। মনে হইল পিতৃপুরুষেরা যেন বলিতেছেন—আজ থেকে তোমার দেহমন তোমার

নয়! সম্রাটের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, জাতিকে দারুণ বিপদ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য তুমি চল্‌লে! অস্থি যদি চূর্ণ হয়, মাংস যদি ছিন্ন হয় তা-ও সহ্য করবে—এই সঙ্কল্প ক'রে যাও! কাপুরুষতা দ্বারা কদাচ পূর্ব্ব পিতামহগণের অসম্মান ক'রো না!

পরিবার পরিজন আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বিদায়ের পানপাত্র হাতে তুলিয়া দিল, তাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইল।

পিতা কহিলেন, সংসারের জন্য চিন্তা নেই! দীর্ঘকালের সকল সাধু-সঙ্কল্প এবার কাজে পরিণত ক'রো! তোমার মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি—দেশের জন্য কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে আমাদের পরিবারের নাম মহোচ্চ সম্মানের পুষ্পে বিভূষিত ক'রো!

আমি বলিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—সৈনিকের জীবনে এর বাড়া সুযোগ আর কি আসতে পারে? আপনার শরীর দুর্ব্বল, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন!

যাত্রাকাল উপস্থিত। বাস্তুপীঠ থেকে তলোয়ার তুলিয়া লইয়া কোমরে ঝুলাইলাম। তারপর মায়ের হাতের জল খাইয়া খুসিমনে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইলাম

সৈন্যদল 'প্যারেড'-ভূমিতে সারবন্দি দাঁড়াইয়াছে—যুদ্ধপতাকা মাঝখানে। জলদগম্ভীর সুরে রণসঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কর্নেলের পানে চাহিলাম—তিনিই আমাদের কর্ণধার। সাহসী সৈনিকেরা অনুভব করিল, তারা যেন তাঁরই হাত-পা। পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, অতঃপর তিনিই তাঁদের স্থান অধিকার করিবেন! গৃহ হইতে চিরবিদায় লইয়াছে, অতঃপর মাঞ্চুরিয়ার অসীম প্রান্তরেই বসবাস করিতে হইবে!

সৈন্যশ্রেণীর উপর আগাগোড়া চোথ বুলাইয়া কর্নেল উচ্চকণ্ঠে তাঁর উপদেশ পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দেশনায়ক সম্রাটের উদ্দেশে সকলে তিনবার 'বান্‌জাই'-ধ্বনি করিল।

—"এই যে শক্তিমান যোদ্ধদলের উদ্ভব হয়েছে, মহামহিম 'মিকাদো'র আদেশে এরা অস্ত্রচালনার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর! এদের গতির সম্মুখে আকাশ বিদীর্ণ হবে, ধরণী চূর্ণবিচূর্ণ হবে!

"পয়লা দল, আগে চলো!"

বিলম্বিত সৈন্যশ্রেণী বিসর্পিত গতিতে পায়ে পায়ে চলিতে সুরু করিল। তালে তালে পদক্ষেপ-শব্দের সহিত পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রের মৃদু ঘর্ষণধ্বনি মিশিল। নিকটে ও দূরে সৈনিকেরা তূর্য্যনিনাদে দেশবাসীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতেছে। প্রবীণ ও তরুণের কণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া ভৈরবরবে মুহুর্মুহু ঘোষণা করিল—'বান্‌জাই'—চিরজীবী হও, চিরজীবী হও!

জাহাজে উঠিলাম। ডেকের উপর পতাকা রাখিলাম। জলযান থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তারপর পিছনে ঝলকে ঝলকে মসীবর্ণ ধূম উদ্গার করিয়া পশ্চিমে যাত্রা সুরু করিল। সহসা আকাশে মেঘ দেখা দিল, অচিরে বর্ষণ আরম্ভ হইল—প্রথমে মৃদুমন্দ, তারপর তীব্র-বেগে, মুষলধারায়।

## সমুদ্রযাত্রা

জয়ধ্বনি এখনো যেন কানে বাজিতেছে, কল্পনা উধাও হইয়া ছুটিয়াছে গিরিদরি নদীসমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিরাট এক রণক্ষেত্রে—সুদূর পশ্চিমে আমাদের যাত্রা। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় নামিব, যুদ্ধ করিব কোন্‌খানে? আমাদের কর্নেল আর জাহাজের কাপ্তেন ছাড়া এ সব খবর কেহই জানে না। যাত্রাকালে তাঁরাও যে খুব বেশি জানিতেন তা নয়; স্থির ছিল, মাঝে মাঝে আদেশ আসিবে।

চেনান্‌পু না ইয়ালুনদীর মোহানা, হাইচেং না পোর্ট-আর্থার অবরোধে—কোথায় যাইতেছি? কেবল অনুমান করিতে পারি, কল্পনা করিতে পারি, তার বাড়া কিছু নয়। কিন্তু যেখানেই নামি বা যুদ্ধ যেখানেই করি, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; অচিরে সম্রাটের আদেশে আমরা নিজ নিজ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিব, ইহাই যথেষ্ট—কেবল এই চিন্তায় মশগুল হইয়া আছি।

সন্ধ্যার দিকে শিমনোসেকি প্রণালী ভেদ করিলাম। জাপানের পানে "শেষ বিদায়ের চাওয়া" চাহিলাম—বিচ্ছেদের শূল বুকে বিঁধিল।

মনে মনে কহিলাম, বিদায় য়্যামাতো!* জন্মভূমি—বিদায়, বিদায়!

সেদিন রাত্রে জাপান-সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ; দিনের বৃষ্টিশেষে আকাশ

---

* জাপান।

এখন মেঘমুক্ত ও নির্ম্মল। চারিদিক নীরব, তাহারই মাঝে হাজার হাজার যোদ্ধা গভীর ঘুমে অচেতন। যুদ্ধযাত্রার এই প্রথম রাত্রি—এ রাত্রে তাদের স্বপ্ন কোন্ পথে ধাবমান—পূর্ব্বে না পশ্চিমে? মৃদু তরঙ্গ, অবাধ মসৃণ গতি, মাঝে মাঝে একটা বিলম্বিত নিঃশ্বাসের শব্দ স্তব্ধতাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিতেছে।

পরদিন প্রভাতে স্বচ্ছ সুমার্জ্জিত আকাশ হাসিতেছে। মৃৎস্যুরে দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া জাহাজের পর জাহাজ হু হু করিয়া চলিয়াছে, বহুদূরে ৎসুশিমার পাহাড় দেখা দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বাজপাখী জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া নামিল। এ পাখীর আবির্ভাব শুভ লক্ষণ, তাই সকলে খুশীমনে তার পিছু পিছু ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল। মাস্তুলের উপরে বসিয়া, কখনো আবার জাহাজের উপরে উড়িয়া ফিরিয়া পাখীটা কিছুকাল আমাদের সঙ্গ ধরিয়া রহিল। তারপর, আশীর্ব্বাদ বিতরণ সাঙ্গ হইলে সে পিছনের জাহাজের সৈন্যদলকে উৎসাহ দিবার জন্য উড়িয়া গেল।

দিন কয় যাইতে-না-যাইতেই মনে হইতে লাগিল, সময় যেন আর কাটে না। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমির তাড়নায় যার যেটুকু পুঁজিপাটা ছিল সমস্তই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে হইল। কেহ বলিতে বসিল বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, কেহ শুনাইতে লাগিল ভূতুড়ে কাহিনী বা হাসির গল্প, আবার আবৃত্তি বা চল্‌তি প্রেমের গানে কেহ বা আসর জমাইয়া দিল। সভ্যদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে অনেকগুলি ছোট ছোট বৈঠক গড়িয়া উঠিল। মাঝে মাঝে কোন তুখোড় লোক লম্ফঝম্প ধুপধাপ করিয়া পালোয়ানী নাচ দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়, কেহ বা সৈনিকের পোঁটলাটিকে বই রাখার ডেস্কে পরিণত করিয়া হাতে পাখা নাড়িতে নাড়িতে পেশাদার কথকের অনুকরণ করে। জাহাজের

মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ আকাশ ও পরিমিত পৃথিবী আনন্দকলরবে মুখর হইয়া ওঠে—অভিনেতাদের মুখে গর্ব্বের ভাব দেখা দেয়। সংক্রামক উৎসাহের ফলে সেই আলুর গাদার মত মানুষের পাল থেকে ক্ষণে ক্ষণে রকমারি খেলা দেখাইবার কত লোক যে বার হয় তার আর ইয়ত্তা নাই।

সকলে যুদ্ধে চলিয়াছে—সে-যুদ্ধ থেকে কেহ ফিরিবার আশা রাখে না। তাই বোধ করি সৈনিকে ও নায়কে এত মাখামাখি, এমন ভাব—সকলে যেন আত্মীয়—একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাই সকলেরই চেষ্টা সকলকে খুশী করার। তাই তারা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী খেলা দেখাইয়া, অভিনয় করিয়া সময়ের ভার কমাইতে চায়—তাই তাদের প্রাণখোলা খুশীর হাসিতে বাতাস কাঁপিতে থাকে—হাসির চোটে সকলের পেটে খিল ধরিয়া যায়।

পিছনে কুয়াসার আড়ালে ৎসুশিমাকে ফেলিয়া সাগরপথে উত্তরে চলিয়াছি—কোরিয়ার পর্ব্বতপুঞ্জ ও গিরিশৃঙ্গ এখনো দেখা যাইতেছে। দিনের পর দিন তেমনি ফুর্ত্তি—মাঝে মাঝে আনাড়ি হাতে পিয়ানোর বাদ্য, ডেকের উপর বাজখাঁই সুরে রণসঙ্গীত। খেলাধূলা কুস্তিতে বিতৃষ্ণা ধরিলে যুদ্ধচালনা-প্রণালী আলোচনা করিতে বসি। ইচ্ছা হয় রণক্ষেত্রের যবনিকা এই দণ্ডে উঠিয়া যাক্, লড়াইয়ের বহর দেখাইয়া শত্রুকে তাক লাগাইয়া দিই—সমগ্র জগৎ সমস্বরে বলিতে থাকুক—সাবাস! সাবাস!

বেশ মনে পড়ে ২৩ শে তারিখে কাপ্তেন আমাদের হস্তাক্ষর চাহিলেন—যুদ্ধযাত্রার স্মৃতিচিহ্ন। একখানি কাগজের মাথার দিকে আমাদের চলন্ত জাহাজ "কাঙোশিমামারু"র ছবি আঁকিলাম। তার তলদেশে কর্নেল আওকি ও অপর নায়কেরা সহি করিলেন! সবশুদ্ধ সাঁয়ত্রিশটি নাম—এখন তাদের মধ্যে ক'জনই বা বাঁচিয়া আছে!

চব্বিশ তারিখ সকালে এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম অনেকগুলি ধূমধারা আকাশ ও জলের সমান্তরালে ভাসিতেছে—জাপানের সম্মিলিত রণপোতবাহিনী আগুসার হইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে! মুক্ত সাগরের বুকে তাদের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সকলের অন্তরে সে যে কি উদ্দীপনার সঞ্চার হইল, বলা যায় না!

দেখিতে দেখিতে একখানি 'ক্রুজার' কাছে আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরিল, বোধ করি কোনো আদেশপত্র আনিয়াছে।

অবতরণের আর দেরি নাই—যুদ্ধক্ষেত্র সন্নিকট। তবুও জানি না কোথায় নামিব বা কোন্ দিকে যাইব।

সকলেরই মনস্কামনা—পোর্ট-আর্থার!

৩

## অবতরণ

আমরা নামিব কোথায়? সমুদ্র-যাত্রার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন কেবলই মনে জাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। জাহাজের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও ঘন ঘন বদল হইতে লাগিল, শেষে যখন জাহাজের যাত্রাপথের নক্সায় দেখিলাম আমরা এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে চলিয়াছি, তখন আমাদের গন্তব্যস্থল যে পোর্ট-আর্থারের পথে কোথাও হইবে তাহা সকলে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলাম। সৈন্যবাহী জাহাজ শান্ত্রী জাহাজের সঙ্গে সেই দিকেই চলিল দেখিয়া আমাদের উত্তেজনা ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।

কিছুকাল পরে ঘন কুয়াসার জাল ভেদ করিয়া গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ দীর্ঘাকৃতি একফালি ভূখণ্ড অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। উহাই লিয়াওতুং উপদ্বীপ। ওখানেই দশ বৎসর আগে জাপানের কত একনিষ্ঠ সাহসী সন্তান অস্থি রক্ষা করিয়াছে। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই আমাদের দেহও ফেলিয়া যাইতে হইবে!

কাল সন্ধ্যা হইতে আকাশ অন্ধকার, ধূসর কুয়াসা ও মেঘ ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়া করিতেছে, মাস্তুলের মাথায় বাতাস শ্বসিতেছে, ঢেউএর পর ঢেউ জাহাজের মুখে আছাড় খাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তুষারকণার মত উড়িতেছে, ঝরাফুলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিছনে কেবল মেঘ আর জল—তার আদি নাই, অন্ত নাই। ঐ মেঘেরও পশ্চাতে আছে, জাপানের আকাশ! সুবিপুল জয়ধ্বনি, বৃদ্ধা নারীদের হাতে জপের গুটির শব্দ, নিষ্পাপ শিশুকণ্ঠের রণসঙ্গীত—সমস্তই যেন এখনো ঝোড়ো-হাওয়ার উপর ভর করিয়া কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে!

উপদ্বীপের পূর্ব্বে য়েন্তা-আও উপসাগর, চীন-সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র শাখা। সেখানেই আমরা নামিব। নিকটে ভাল বন্দর কোথাও নাই, আছে এক তালিয়েনওয়ান্—তা'ও শত্রুর অধিকারে। অগত্যা দায়ে পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এইখানেই আমাদের নামিতে হইবে। এখানে সমুদ্র বা তার স্রোত, কিছুর উপরই বিশ্বাস নাই—সামান্য একটু ঝড় উঠিলে নামা ত দূরের কথা, নঙ্গর করিয়া থাকাও কঠিন। তা ছাড়া এখানকার জল অগভীর, বড় জাহাজ মাত্রেই তীরভূমি হইতে ক্রোশাধিক পথ দূরে নঙ্গর করে। বাতাস জোরে বহিলে জাহাজ ভাসিয়া কয়েক ক্রোশ তফাতে সরিয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অবতরণের তদ্বির যাঁরা করিবেন তাঁদের ক্লেশ ও উদ্বেগ সহজেই অনুমেয়।

পাখীর মা শাবককে যেমন করিয়া আগলায় আমাদের রণপোতগুলিও

তেমনি নিকটে ও দূরে সতর্ক পাহারা দিতেছে, পাছে নামার সময় অতর্কিতে শত্রু আক্রমণ করে। বিপদ আসিল কিন্তু অন্যরূপে। সকালে যে বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল, ক্রমেই তার বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বীচিবিক্ষুব্ধ অশান্ত সাগর পাহাড়প্রমাণ হইয়া উঠিল—তার উপর সৈন্যবাহী জাহাজ ও 'সাম্‌পান' * উড়ন্ত পাতার মত দুলিতে লাগিল। বাতাসে বিপর্য্যস্ত ভাড়াটে চীনা নৌকার মাস্তলগুলো অরণ্যের বৃক্ষরাজির মত—মনে হয় যেন হাকাতা-উপসাগরে মোঙ্গল-আক্রমণের একখানি প্রকাণ্ড ছবি দেখিতেছি!

এমন ঝড়ে কি নিরাপদে নামা সম্ভব? তীরে পা দিয়াই কি শত্রু সম্মুখীন হইতে হইবে? আমাদের অবস্থা গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মত—আশপাশের খবর কিছুই জানি না। কেবল কর্নেলই সমস্ত জানেন—তাঁরই হাতে আমাদের জীবন মরণ। সে যাই হোক, আমরা জানি আপাততঃ সম্মুখে আমাদের দুটি কাজ—তীরে নামা ও হাঁটিয়া চলা।

ক্ষণকাল অপেক্ষার পর বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অবতরণ সুরু হইল—বোধ করি যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে বিলম্ব সহে না। শত শত নৌকা, 'সাম্‌পান্' ও ষ্টীমার সৈনিক ও নায়কদিগকে রহিবার জন্য জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল। এ সব কোথা হইতে কিরূপে আসিল কে জানে? অতিকায় তরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই উপত্যকার মত গভীর গহ্বরে নামিয়া আরোহীসমেত নৌকাগুলোকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পতাকা লইয়া কর্নেলের সঙ্গে একই নৌকায় উঠিলাম।

এক এক ষ্টীমারের সঙ্গে অসংখ্য ছোট নৌকা বাঁধা— জপমালার

* চীন ও জাপানে ব্যবহৃত ছোট নৌকা—আমাদের পান্‌সির মত।

গুটির মত। উঠিয়া পড়িয়া ধাক্কাধাক্কি করিয়া বাঁশি বাজাইয়া নৌকার মালা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাসময়ে যুদ্ধপতাকা ঝড়জল তুচ্ছ করিয়া নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইল। শত্রু-অধিকৃত ভূমিতে পা বাড়াইলাম—একবার...দুইবার। মনে হইল মাত্র কাল যেন পিতৃভূমি ছাড়িয়াছি, আর এখন ইহারই মধ্যে, স্বপ্নে নয়, সত্যসত্যই আকাঙ্ক্ষিত দেশের উপর পদক্ষেপ করিতেছি!

মহামহিম সম্রাটের পতাকা পুনর্ব্বার লিঁয়াওতুং উপদ্বীপের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম—এ কি অপূর্ব্ব আনন্দ! ভ্রাতৃরক্তপূত এই ভূমি—এ-মাটির সঙ্গে জাপানের মাটিও যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া আছে!

ঝড়ের বেগ বাড়িয়াই চলিল—মনে হইল সকলের তীরে পৌঁছান অসম্ভব, অথচ জাহাজে ফিরিবারও উপায় নাই। একমাত্র উপায়, নৌকা তীরের কাছাকাছি আনিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া জলঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া কোনো গতিকে তীরে আসিয়া ওঠা।

কাপ্তেন ৎসুকুদো তাঁর অধীনস্থ সাটজন আন্দাজ সৈনিক লইয়া একখানি নৌকায় চড়িয়া ছিলেন। ছোট একখানি 'ষ্টিমলঞ্চ' সেই নৌকা টানিয়া তীরাভিমুখে আসিতেছিল। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পড়িয়া নৌকাখানির দুর্দ্দশার একশেষ! উহা বলের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—মনে হইল সমুদ্র অচিরে উহাকে গ্রাস করিবে! গতিক দেখিয়া নৌকার বাঁধন কাটিয়া দিয়া লঞ্চখানি রণে ভঙ্গ দিল। কথায় বলে, যে অতিকায় 'হো' * দশ হাজার মাইল অবিরাম ছুটিতে সক্ষম, সমুদ্র-তরঙ্গ তার পাখাও না কি ভাঙিয়া দিতে পারে! মনে হইল, 'মাছের পেটে সমাধিলাভ' করা ছাড়া অতি দুঃসাহসিকেরও আর

* কাল্পনিক পাখী।

গতি নাই! উদ্ধার অসম্ভব, বিধির বিধান মানিতেই হইবে! মরণের জন্য তারা প্রস্তুত, কিন্তু হাতের কাছে যে-শত্রু, তার প্রতি একবার অস্ত্রক্ষেপ করিবার আগেই সমুদ্রের জঞ্জালে পরিণতি...এ যে একেবারে অসহ্য।

ক্যাপ্তেনের মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল, চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস—সৈনিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! নির্জ্জন প্রান্তরে প্রাচীন পরিত্যক্ত কূপের মধ্যে নিপতিত ব্যক্তির মতই যে তাদের অবস্থা! ডুবিতেছে না, অথচ উঠিতেও পারে না—প্রাণরক্ষার আশায় লতাগুল্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া দেখে বন্য মূষিক তারও মূলোচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে!

পরিশেষে মরিয়া হইয়া কাপ্তেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, তারপর তীরের দিকে সাঁতার দিয়া চলিলেন—কিন্তু তাঁর অধীর অদম্য আগ্রহের কাছে. নিষ্ঠুর তরঙ্গ হার মানিল না। তারা নির্দ্দয়ভাবে তাঁকে ক্ষণে গ্রাস ক্ষণে উদ্‌গার করিয়া তালগোল পাকাইয়া লোফালুফি করিতে সুরু করিল। তীরে পৌছিবার পূর্ব্বেই শ্রান্তিভারে অবসন্ন হইয়া তিনি জ্ঞান হারাইলেন।

বিধাতা কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, সমুদ্রতীরে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পড়িয়া আছেন। নগ্ন দেহ আবৃত করিবার তর্ সহিল না, তিনি তদবস্থায় তীরাবতীর্ণ সৈন্যদলের ছাউনিতে ছুটিয়া গেলেন। তারপর উন্মাদের ভঙ্গীতে ইসারায় ইঙ্গিতে নৌকারোহী অনুচরদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন! তখন তাঁর অশ্রু শুকাইয়া গেছে—কাঁদিবার শক্তিও নাই। আড়ষ্ট মুখে বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে!

শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সৈন্যদল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

মনের মাঝে যে দেশের ছবি আঁকিয়াছিলাম সে কি এই দেশ? দশবৎসর আগে জাপানী হৃদিরক্ত দিয়া এই স্থান কিনিয়াছিল—আজ দেখিয়া ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! এ যে রুক্ষ শুষ্ক জনহীন মরুপ্রান্তর, এক পরিত্যক্ত বালুকাবিথার, তরঙ্গায়িত ভূমির অসীম প্রসার! একঘেয়ে নগণ্য পটভূমিকার উপর কেবল যেন গাঢ় লাল আর তরল ধূসরের প্রলেপ! জাপানের যে বিচিত্র ও পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে আমরা অভ্যস্ত, তার তুলনায় এ ছবির সর্ব্বত্র একটা অমার্জ্জিত অসম্পূর্ণ অযত্নের ভাব পরিস্ফুট।

অবতরণস্থলে ঘোড়া ও মালগাড়ি লইয়া কাজের প্রত্যাশায় শত শত চীনা জমা হইয়াছে—এও একটা নূতন দৃশ্য বটে! এরা মানুষ না জন্তু? ভুষমণ চেহারা; ফিসফিস করিয়া পরস্পরে কথা কয়, তারপর আগাইয়া চলে। দুষ্ট লোক হিসাবে তারা প্রীতিলাভের অযোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কু-শাসিত রাজ্যের প্রজা হিসাবে তারা নিশ্চয়ই অনুকম্পার যোগ্য।

গোড়ায় গোড়ায় তারা জাপানীকে ভয় করিত, দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের লক্ষ্য করিত—নিকটে আসিত না। সম্ভবত রুশেরা তাদের ধনসম্পত্তি লুট করিয়াছে, স্ত্রীকন্যাকে বেইজ্জত করিয়াছে। স্থানীয় লোকেদের প্রতি যাহাতে ন্যায়ানুগত সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, দৈনিক কর্ত্তব্য যাহাতে তারা নিরাপদে সম্পাদন করিতে পারে—সেদিকে জাপানী সৈন্যদল বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ফলে অচিরে তাদের মন আমাদের প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিল—সাগ্রহে তারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তবুও বলিতে হয়, তারা এমন জাতের লোক যারা অর্থলোভে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে পারে,

দশহাজার মোহর পকেটে থাকিতেও যারা শূকরের খোঁয়াড়ে বাস করে!

"আতা, আতা! য়ো, য়ো!"—সর্ব্বদা এই অদ্ভুত বুলি শুনিতে পাই, চীনারা এই বলিয়া গরু ঘোড়া চালনা করে। গৃহপালিত পশু পরিচালনায় তারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি নিপুণ। জীবজন্তু তাদের এমন আজ্ঞাবহ দেখিয়া অবাক হই। ইসারার শব্দে তারা বামে বা দক্ষিণে যায়—চাবুকের ব্যবহার আদৌ নাই, অথচ তারা চলে চালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই সহজে। এই সব চীনা ও তাদের পালিত জীবদের মধ্যেকার সম্বন্ধ সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের নায়কের সম্বন্ধের মত। যুদ্ধে পারদর্শিতা ও নিয়ম মানিয়া চলার মূলে বেত বা ধমকের ভয় নাই—আছে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বাধ্যতা।

অনেক হাঙ্গামার পর কয়েকটি দল তীরে নামিল। বাদবাকির অবতরণ ঝড়ের উপদ্রবে স্থগিত রাখিতে হইল। কর্নেল, দোভাষী ও রক্ষীর সঙ্গে রাত্রি-আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ম্যাপ ও কম্পাস লইয়া আমরা যখন ব্যস্ত, দোভাষী তখন প্রশ্নের পর প্রশ্নে চীনাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। চীনা-জাপানী বাক্যালাপের বইখানা বার করিয়া ভাঙা-ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "রুশসৈন্য—তারা কি আসিয়াছে?" জবাব পাইলাম, "পোর্ট-আর্থারে তারা পালাইয়াছে।" অবিলম্বে শত্রুসম্মুখীন হইতে না পারিয়া আমরা নিরাশ হইলাম।

বালুকাময় সমতলের উপর দিয়া প্রায় নয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে 'উইলো'-ঢাকা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। অজানা পাখীর দল তখন দ্রুতগতি নীড়ে ফিরিতেছে।

বোকাটে বুড়ো আর নোংরা ছোঁড়ার দল পিঁপড়ের মত চারিদিকে

জড়ো হইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাদের কৌতূহলের সীমা নাই।

বুড়োদের মুখে লম্বা লম্বা ধূমপানের নল—দেখিয়া মনে হয় দেশে যে বিষম বিপদের সূচনা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন অথবা অচেতন। যেমন সব বাড়ি তেমনি তাদের বাসিন্দা—সে যে কি নোংরা, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নবাগত আমরা উৎকট দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম।

নামেই ছাউনি—বাড়ির আলিসার তলে আশ্রয় লইয়াছি। এখানেও ছোট বড় চীনার ভিড়, তাদের গায়ে রসুনের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। ক্ষুধায় আমরা কাতর, তবুও গরম গরম ভাতের নাড়ু পেটের মধ্যে গিয়াই সেই দুর্গন্ধে আবার বাহির হইয়া আসিতে চায়।

লিয়াওতুঙে প্রথম রাত্রি এইভাবে কাটিল। তৃণশয্যায় আধখোলা তাঁবুর তলে শীত ও বৃষ্টির উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া অনেকে গভীর ঘুমে মগ্ন হইল। কেহ কেহ সারা রাত খড়ের ধোঁয়াটে আগুনের ধারে বিনিদ্র বসিয়া বসিয়া চিন্তার অতলে ডুবিয়া গেল। পাথরের দেওয়ালে খাবারের কৌটাগুলি ঝুলিতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই—বিদায়কালে-পাওয়া খাবার তারা আনমনে চিবাইতেছে।

ভোর হয়-হয়, এমন সময় পশ্চিমাকাশ বিদীর্ণ করিয়া সহসা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল, মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। ব্যোমচারী বিদ্যুৎ নয়—অগ্নিশিখা; বজ্রনিনাদ নয়—কামানগর্জ্জন। প্রবল বাতাস উঠিয়া দৃশ্যটাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিল—দেখিতে দেখিতে আকাশে যেন রক্তের ছোপ ধরিয়া গেল!

নান্‌শানের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে।

# নান্‌শান্‌

নান্‌শানের দিকে সেই আগুনের খেলা ক্রমে ভীষণ ও উদ্দাম হইয়া উঠিল। লড়াইয়ের খবর কি? আমাদের দল সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে ত? জায়গাটা দখল হইল, না এখনো চেষ্টা চলিতেছে? এই আমাদের প্রথম যুদ্ধ—এ যুদ্ধে যোগ দিতে হইলে তৎপরতার প্রয়োজন, এমন সুযোগ হেলায় হারাইবার নয়। কিন্তু যাত্রার হুকুম আসে কই? মন নান্‌শানের পানে উধাও হইল, অসহিষ্ণুতার আর সীমা নাই।

ওদিকে, আমাদের অনুবর্ত্তী দল নিরাপদে তীরে অবতীর্ণ হইল কি না, জানি না। কর্নেলের হাতে মাত্র পাঁচ'শ' লোক—নিতান্ত ছোট একটি দল। এই ক'জন সৈনিক লইয়া তিনি কি আগুসার হইবার সাহস করিবেন? তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, অবিলম্বে আমাদিগকে রণক্ষেত্রে হাজির করা সম্ভব নয়। তবে কি কেবল দূর হইতে যুদ্ধটি দেখিব—সাহায্যে অগ্রসর না হইয়া? নদীর এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের অগ্নিকাণ্ড দেখার মত?

মন নিরাশায় ভরিয়া উঠিল। অবশ্য যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলার সম্ভাবনা—সবে যবনিকা উঠিয়াছে—এই নান্‌শান্‌ ত আর শেষ অঙ্ক নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের এত কাছে আছি, অথচ শত্রু-সম্মুখীন হইবার উপায় নাই; যুদ্ধের আওয়াজ পাইতেছি অথচ সেদিকে যাইতে পারি না—এ অবস্থা বড়ই ক্লেশকর।

কথায় বলে—যে অপেক্ষা করে সবই তার কাছে আসে। একদিন আদেশ পৌঁছিল—কমাণ্ডার ওকুর নেতৃত্বে দ্রুতগতি নান্‌শান্‌ যাত্রা

করো! কর্নেল আদেশটি ঘোষণা করিলে সকলে এমন খুশি হইল যেন দৈববাণী শুনিয়াছে! যাত্রার জন্য ত তারা পা বাড়াইয়াই আছে—এখন কেবল চলো, চলো, ছুটিয়া চলো! পা দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া ক্ষেতের পর ক্ষেত, গ্রামের পর গ্রাম পদাঘাতে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম, কত ক্রোশ ছুটিলাম সে-চিন্তা একবারও মনে আসিল না। শত্রুর মূর্ত্তি চোখের সুমুখে যেন ভাসিতেছে, তাই বেদনা বা শ্রান্তিবোধ নাই। স্বেদবিন্দু আর পায়ের ধূলা মুখের উপর যেন মুখোস পরাইয়া দিল—কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? দেখিতে দেখিতে জলের বোতল খালি হইল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, তবুও একটি লোক শ্রেণীচ্যুত হইল না। শত্রুর কল্পিত আস্তানার দিকে চাহিয়া কামান গর্জ্জনের পানে ছুটিয়া চলিয়াছি—শ্রান্তি, বেদনা বা বাধাবিঘ্নের কথা আর মনে নাই।

"নান্‌শান্ এখনো টি'কিয়া আছে ত?"

"লড়াই জমে' উঠেছে, চট্‌পট যাও!"

এমনি কথাবার্ত্তা নান্‌শান্-ফেরতা কুলি ও সৈনিকদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যাইতেছে! কথাটা শুনিতে বোকার মত হইলেও, কামনা করিতেছিলাম, যেন আমরা পৌছানর পূর্ব্বে নান্‌শানের পতন না হয়। হয় ত মনে আমাদের গর্ব্ব ছিল, আমাদের মত তাজা সৈন্যদলের সাহায্য বিনা পরিশ্রান্ত যোদ্ধারা স্থানটা দখল করিতে পারিবে না!

পথে দেখিলাম জন দুই তিন শত্রুপক্ষীয় নায়ক বন্দী অবস্থায় জাপানী শিবিরে নীত হইতেছে। দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। পরাজিত শত্রুর প্রথম দর্শন লাভে আনন্দ এবং নান্‌শান্ হয় ত ইতিমধ্যে অধিকৃত হইয়া গেল এই আশঙ্কা! পথ চলা অভ্যাস করিবার জন্য যখন সৈন্যদল 'মার্চ' করে; অথবা যুদ্ধের

সময়, কিন্তু ঠিক লড়াইয়ে যোগ দিবার জন্য নয়—তখন তাদের বিশ্রাম ও আহারের যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু যখন একটা চল্‌তি লড়াইয়ে যোগদানের জন্য তারা চলে, তখন ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া খাদ্যপানীয় ব্যতিরেকেই চলিতে হয়! প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে সের দশেক ওজনের একটি করিয়া পুঁটুলি ও একবোতল করিয়া জল থাকে। বোতল খালি হইবার পর আর এক ফোঁটা জল পাওয়ার উপায় নাই। দিনের পর দিন মাঠের মাঝে তাঁবু গাড়িয়া বিশ্রাম বা নিদ্রা—ঝড়বৃষ্টি যতই হোক, সেইখানেই থাকিতে হয়, বাড়ির কার্নিশের তলেও আশ্রয় লইতে পারে না। শ্রান্তির অবসাদ বা ব্যথাবোধের অজুহাতে মুক্তি নাই। মুখের ঘাম মুছিবার সময় নাই, তাহা নোনা বাতাসের সংস্পর্শে অচিরে জমিয়া সাদা হইয়া ওঠে। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, তবুও হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কোনোগতিকে অগ্রসর হয়।

মানুষকে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়ত নিষ্ঠুর বোধ হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে সুখসুবিধা সব যে ত্যাগ করিতেই হয়। একজন সৈনিকেরও ত পিছাইয়া পড়িলে চলে না—আক্রমণ যারা করিবে, তাদের দলে একটি বন্দুকের অভাবও যে মস্ত অভাব। এমনি দুরূহ মার্চের পর সৈনিকেরা তখনি ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হয়! তবেই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় 'মার্চ' করিবার সময়েই একরকম নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই জন্যই শান্তির সময়েও সৈনিকদিগকে জলপান না করিয়া 'মার্চ', রাত্রিকালে 'মার্চ' এবং দ্রুত 'মার্চে' তালিম দিতে হয়।

মহোৎসাহে ধাবিত হইতেছি—বলা উচিত, উন্মত্তের মত চলিতেছি—প্রথম যুদ্ধে মনে কেবল এই চিন্তা। ক্রমে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিলাম, গাছের তলায় ও পাহাড়ের গায়ে ছুঁচলো শিবিরশ্রেণী

চোখে পড়িল। সেগুলি হাসপাতাল। তাঁবুর সংখ্যা দেখিয়া যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে ভাবনা হইল। খাটিয়ার পর খাটিয়ায় আহতেরা আসিতেছে। তাদের নামাইয়া বাহকেরা আবার ছুটিতেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, আরও আনিবার জন্য। চলার শক্তি যাদের লোপ পায় নাই, তারা খাটিয়ার পিছু পিছু আসিতেছে, দলে দলে—সারা পথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে। খাটিয়া-শায়িত বা পদচারী—সকলেরই দেহ রক্তে কাদায় মাখামাখি। শোণিতসিক্ত সাদা ব্যাণ্ডেজে সম্মানের ক্ষতচিহ্ন আবৃত—খাটিয়ার ভিতর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িয়া মাটিকে মহিমান্বিত করিতেছে! এমন সময় যে দূত আদেশ লইবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল, খবর দিল—নান্‌শান্ দখল হইয়াছে! সমস্ত 'রিজার্ভ' সৈন্য চুংচিয়াতুনের নিকটে আড্ডা গাড়িয়া নূতন আদেশের প্রতীক্ষায় থাকুক!

শুনিয়া, নায়ক হইতে ঘোড়ার সহিস পর্য্যন্ত সকলেই দুঃখে ও নিরাশায় নির্ব্বাক হইল। সত্য বটে শত্রুপক্ষের কাছে নান্‌শান্ ছিল পোর্ট-আর্থারের চাবির মত; সেই স্থান দখল হওয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। শুভ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত ছিল, এবং আমরা অবশ্য তাই করিলাম। তবে নিরাশ হইলাম বলিয়া দোষ দিলেও চলিবে না। জাহাজ ছাড়িয়াই একদমে ছুটিয়া আসিতেছি, তারপর যথাস্থানে পৌঁছিয়া শুনি, আমাদের কাজ অন্যে শেষ করিয়াছে!

মাত্র একটি পাহাড় আমাদের সম্মুখে—তারপর রক্তস্রোত আর মৃতদেহের স্তূপ। সেখানে পৌঁছিতেই শ্রবণবিদারী কামান-গর্জ্জন সহসা থামিয়া গেল—গিরিশ্রেণী ও উপত্যকা আবার অনাদি স্তব্ধতার মাঝে অবগাহন করিল। আহতেরা অবিরাম চলিয়াছে—ইহাই কেবল

দেখিতেছি। দেখা হইলেই তাদের সান্ত্বনা দিই—তাদের কীর্ত্তির জন্য সাধুবাদ করি।

এখন পাহাড়ের তলায় বিশ্রামের পালা। যুদ্ধফেরতা এক সহিস সগর্ব্বে লড়াইয়ের বর্ণনা সুরু করিল। মাথা দুলাইয়া হাত নাড়িয়া পেশাদার কথকের মত বলিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে ভারি উত্তেজনার সঞ্চার হইল একটি জলের বোতল দেখাইয়া বলিল, সেটি এক রুশ সৈনিকের স .ত্তি। তার বলার ভঙ্গীতে মনে হইতেছিল সে যেন একাই শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিয়াছে! আমরা এখনো বন্দুকে টোটা ভরি নাই, খাপ হইতে তলোয়ার খুলি নাই, তার কথা শুনিয়া দমিয়া গেলাম, বিষম লজ্জা বোধ হইল। জানি, সহিসটা কিছু আর যুদ্ধ করে নাই, তবুও কেমন মনে হইতে লাগিল, সে যেন একটা মস্ত বীরপুরুষ! প্রচুর তারিফ করিতে করিতে তার কাহিনী যেন আমরা গিলিতে লাগিলাম! কত প্রশ্নই যে তাহাকে করিতে লাগিলাম তার আর হিসাব নাই।

চুংচিয়াতুনে রাত্রিবাস করার আদেশ আসিল। আবার একই রাস্তা ধরিয়া ক্রোশদুই পথ পিছনপানে চলিতে হইবে! এবার আর উৎসাহ নাই—সৈনিকেরা যেমন ঘোড়াগুলাও তেমনি, মাথা নীচু করিয়া পায়ে পায়ে হাঁটিয়া চলিল। পথ হইতে পীতাভ ধুলা উড়িতে লাগিল, তার আবরণে ক্রমে আমাদের মূর্ত্তি হইল যেন হলদে-মটরগুড়ো-মাখানো ফুলরী। নান্‌শানের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিনরাত অবিরাম যখন হাঁটিয়াছিলাম, তখন মোটেই পা ব্যথা করে নাই, এখন ফিরতি পথে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। পা যেন আর চলে না—ইঁট পাটকেল মাড়াইয়া ফেলি, খানাখন্দে পা পড়ে, মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, দেহে মনে কোথাও

যেন আর শক্তি নাই—সমস্তই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষানুক্রমে জাপানী যে-মনোভাব অর্জ্জন করিয়াছে, তার মধ্যে পিছুহটার স্থান নাই—নিশ্চিত মৃত্যুমুখেও নয়। যুগে যুগে কঠিন নিয়ম পালনের দ্বারা এই মনোভাব দৃঢ়তর হইয়াছে, তাই বোধ করি পিছন পানে চলিতে এত কষ্ট!

শেষ পর্য্যন্ত চুংচিয়াতুন পৌঁছিলাম। জনশূন্য গ্রাম, মাঝ দিয়া এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত। চাঁদের মুখ ম্লান পাণ্ডুর, আকাশ নক্ষত্রবিরল। মাতৃরূপা প্রকৃতি তৃণশয়নে নিদ্রিত, শ্রান্ত ক্লান্ত আশাহত সৈনিকের দুঃখের ভাগ যেন লইয়াছে—সেদিন যুদ্ধে যারা মরিয়াছে তাদের শোকে সে যেন মর্ম্মাহত। রাত অনেক, তবুও মাঝে মাঝে বিনিদ্র লোক চোখে পড়িতেছে—নব নব ভাবের আনাগোনায় বোধ করি মন তাদের অশান্ত। শূন্যপথে ধাবমান কোকিলের বিক্ষিপ্ত কুহুরব, ঘুমহারা সৈনিকের কণ্ঠে 'বিওয়া'* গানের দুই এক পদ গুন্‌গুনানি—রাত্রির কি বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ মূর্ত্তি!

৫

## যুদ্ধশেষে

কোনোগতিকে চুংচিয়াতুনে সে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকালে নান্‌শানের তলায় এক গ্রামে আড্ডা গাড়িবার আদেশ আসিল। আমাদের রেজিমেণ্টের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দল নান্‌শানের পাহারায় মোতায়েন হইবে।

---

* তারের বাদ্যযন্ত্র।

নান্‌শানে পৌঁছিলাম। খাড়া পাহাড়টার মাথায় উঠিয়াই দেখি এক বহুবিস্তৃত তরঙ্গায়িত ভূমি। তার দক্ষিণে কিন্‌চাউ ও বামে তাহোশাংসান পাহাড়। কালকের ভীষণ যুদ্ধ এখানেই হইয়াছিল।

সামনের এক পাহাড় থেকে সাদা ধোঁয়া উঠিতেছে—বহুদূর পর্য্যন্ত উহা একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়াইতেছিল। সাহসী সৈনিকদের মৃতদেহের সৎকার হইতেছে—রণক্ষেত্রের বেদীর উপর দেশের জন্য যারা প্রাণ দিল তাদের দেহ ভস্মে পরিণত হইতেছে! ধূমাবরণে দেশভক্তের শত শত আত্মা স্বর্গে চলিয়াছে! টুপি খুলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলাম! ঘরে যখন মা ছেলের কথা ভাবিতে ভাবিতে নাটাইয়ে সুতা জড়াইতেছে আর পত্নী শিশুকে পিঠে বাঁধিয়া সেলাই করিতে করিতে পতিচিন্তা করিতেছে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সব সন্তান ও পতি খণ্ড-বিখণ্ড চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া ধূমপুঞ্জে পরিণত হইতেছে!

উপত্যকার তলে বা পাহাড়ের ধারে মৃতদেহের স্তূপ—সেই-সব দেহে গাঢ় রক্তের কালো দাগ। মুখ নীল, চোখের পাতা ফুলো-ফুলো, রক্ত ও ধুলামাখা চুলে জট বাঁধিয়াছে, সাদা সাদা দাঁত ঠোঁট চাপিয়া বসিয়াছে। পোষাকের লালটারই কেবল বদল হয় নাই।

দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। মনে হইল, আমিও শীঘ্রই অমনি হইব—কাছে গিয়া ভাল করিয়া যে দেখিব এমন সাহস কাহারও হইল না। আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায় দূর হইতে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইতে লাগিলাম। রক্তমাখা পাদচ্ছদ (gaiters), পোষাক, টুপি ও অন্তর্বাসের (underwear) টুকরা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—চারিদিকে পূতিগন্ধ, বীভৎস দৃশ্য। শত্রুপক্ষের খাতের (trench) ধারে ধারে অসংখ্য বারুদের বাক্স ও খালি কার্ত্তুজের গাদা—তারা আক্রমণকারীদের উপর কতটা মরিয়া হইয়া গুলি চালাইয়াছে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ।

শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ দেখিলেই তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিতেছে; মনে হইতেছে, হোক শত্রু, তাঁরাও ত স্বদেশেরই জন্য প্রাণ দিল!

সযত্নে তাদের সমাহিত করা হইল, কিন্তু এই পরাজিত বীরদের নাম আমরা জানি না—ভবিষ্যতে যারা আসিবে তাদের জন্য সে-নাম রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। গৃহে তাদের পিতামাতা, পত্নী বা সন্তানেরা জানিতে পারিবে না—কবে, কোথায়, কেমন করিয়া তাদের প্রিয়জন প্রাণ হারাইল। প্রায় সকলেরই বুকে ক্রুশচিহ্ন কিম্বা হাতে "আইকন"। আশা করি মৃত্যুকালে তারা ভগবানের করুণা লাভ করিয়াছে।

কারও কারও পোষাকে নম্বর ছিল, সেগুলি আমরা শত্রুপক্ষকে জানাইয়াছিলাম। তাহা দ্বারা মৃতের নাম নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। কিন্তু যাদের সনাক্ত করিবার মত কোনো চিহ্ন ছিল না, তাদের নাম চিরতরে অজানার গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আপাতত য়েন্‌চিয়াতুনে থাকার বন্দোবস্ত হইল। রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট চীনা বাড়িতে সবে পৌঁছিয়াছি, হঠাৎ পাশের বাড়ি হইতে মানুষের কাতরানির শব্দ কানে পৌঁছিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম, এ যে একেবারে নরকের বিভীষিকা! উঠানে জন পনেরো যোলো মরণাহত জাপানী ও একজন রুশ পরস্পরের গায়ের উপর গাদাগাদি পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আমাকে দেখিয়া একজন হাতজোড় করিয়া সাযায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারা তো ভাগ্যের কথা, এর জন্য আবার কাকুতিমিনতি?

কেন যে হতভাগ্য সৈনিকেরা এ অবস্থায় পড়িয়া আছে, কিছুই বুঝিলাম না। আগে জানিলে ভালরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা

যাইত। যাই হোক, তখন ডাক্তার ডাকিয়া তাদের যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা সুরু হইল। ডাক্তারেরা যখন তাহাদের আহত অঙ্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তখন তারা অভিভূত কণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, "আপনার এ দয়া কখনো ভুলব না, আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব, আপনি আমাদের বাঁচালেন, বাঁচালেন!" অশ্রুধারা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না, কথা-গুলা তাদের অন্তর নিঙড়াইয়া বাহির হইতেছে—কেবল কথার কথা নয়।

শুনিলাম, দু'দিন তারা এককণা খাবার বা এক বিন্দু জল পায় নাই। সকলেরই আঘাত গুরুতর—কারও পা ভাঙিয়াছে, কারও বাহু চূর্ণ হইয়াছে, কারও বা মাথায় অথবা বুকে গুলি লাগিয়াছে! কারও কারও পরমায়ু আর আধ ঘণ্টাও নয়—তারাই আবার পরস্পরের হাত ধরিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, কত সমবেদনা জানাইতেছে, সান্ত্বনা দিতেছে! লড়াইয়ে আমাদের পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা চার হাজারের বেশি, ইচ্ছা করিলেই কি সকলের সেবা শুশ্রূষা সম্ভব?

দেখিতে দেখিতে দুজনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে চোখ মুদিত হইল, অধরের কাঁপন থামিয়া গেল। পাশের এক সৈনিক আমাকে বলিল, "ওদের মধ্যে একজন বাড়িতে কেবল বুড়ী মাকে রেখে এসেছে!"

মৃত বা আহত যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে দেখিলে ভারি কষ্ট হয়। তারাও সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে আসিয়াছে! গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া কামান গর্জ্জনে ভয় না পাইয়া প্রভুকে পিঠে লইয়া সানন্দে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া ফিরিয়াছে! প্রভুর যত্ন ও দয়ার প্রতিদান দিতে পারিল, মৃত্যুকালে ইহাই যেন তাহারা ভাবিতেছে!

ভারি বোঝা বহিয়া, ভারি গাড়ি টানিয়া, মালবাহী ঘোড়াগুলিই কি নীরবে কম যন্ত্রণা সহ্য করে? যুদ্ধ জয় অবশ্য নির্ভর করে সাহসী

সৈনিক ও নায়কের চেষ্টার উপর, কিন্তু এই সব অনুগত জীবের সাহায্যও ত ভুলিলে চলিবে না! মোটা খড় ও কাদাগোলা জলেই তারা তুষ্ট, অবিরাম বৃষ্টি বা তুষারপাতের মধ্যেও অসন্তোষ নাই, প্রভুর একটু আদরই তাদের সবার বাড়া আরাম। কাজ তারা সৈনিকের মতই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে,কিন্তু তারা ভাষাহীন—আঘাত বা যন্ত্রণার কথা বলিতে পারে না। অসুখ হইলে কখনো কখনো ঔষধ জোটে না, এমন কি একটুখানি আদর, একটু হাতের স্পর্শও নয়। যন্ত্রণায় ছটফট করে, অবশেষে একদিন শেষ বিদায়ের ডাক ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করে—কেহ একবার ফিরিয়াও চাহে না! অনাবৃত মুক্ত প্রান্তরে তাদের মৃতদেহ পড়িয়া থাকে, কাক ও নেকড়ে আসিয়া সে দেহ খাইয়া ফেলে! কঠিন স্থূল অস্থিগুলা দিনের পর দিন ঝড়-ঝাপটার তাড়নে বিপর্যস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে!

এই সব অনুগত ঘোড়াও ত বীর—কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া ভীষণ মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে! কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত তাদের স্মরণ করা উচিত নয় কি? বৌদ্ধবতি নাকাবায়াষি আহতের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাকার্য্যের অবসরে তিনি গোলার টুক্‌রা সংগ্রহ করিতেন। বলিতেন, তাহা দিয়া এক অশ্বারোহী 'কানন' * মূর্ত্তি তৈরি করাইবেন। তার ফলে হয়ত যুদ্ধে নিহত ঘোড়াগুলির আত্মার পরিতৃপ্তি হইতে পারে!

শত্রুপক্ষের ব্যবস্থার পরিচয় লইবার জন্য একদিন নান্‌শানের পাহাড়ে উঠিলাম। আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত নিখুঁত,এক মহা যোদ্ধাজাতির সম্পূর্ণ উপযোগী। তারের বেড়া, খানাখন্দ ও ভূমিগর্ভে বিস্ফোরক 'মাইনের' কথা নাই বলিলাম! পাহাড়ের চারিদিকে খাতের পর খাত

* জাপানী পুরাণোক্ত করুণা দেবী।

—সর্ব্বত্রই 'মেশিন্‌গান্' চালাইবার রন্ধ্র। অনেক কেল্লার ভিতর হইতে অতিকায় কামান মুখ বাড়াইয়া আছে দেখিলাম। স্থানটি সুরক্ষিত করিবার প্রায় কায়েমি বন্দোবস্ত। সৈন্যাবাস, গুদামঘর কিছুরই অভাব নাই। গুদামে সর্ব্ববিধ শীতবস্ত্র—রেলপথ ও 'ব্যাটারি'ও রহিয়াছে। নায়কের বাড়ির সাজসজ্জা ও আরামের উপকরণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঘরের আসবাবপত্র চমৎকার—দেখিলে আর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে থাকে না। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগিল, যখন দেখিলাম স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস ও প্রসাধন-সম্ভার এবং শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ ইতস্তত ছড়াইয়া আছে!

দূরবীন দিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে দেখি বেলাভূমির উপর অসংখ্য মানুষ ও ঘোড়ার মৃতদেহ—ধূসর তরঙ্গ তাদের উপর দিয়া আনাগোনা করিতেছে! ইহারা শত্রুর অশ্বারোহী সেনাদলের অবশেষ—পদাতিক-দের ডান পাশ রক্ষা করিবার জন্য মোতায়েন ছিল। পশ্চিম তীর হইতে অতর্কিতে পিছন দিকে আক্রান্ত হইয়া পালাইবার পথ পায় নাই—বিতাড়িত হইয়া প্রায় সকলেই সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে! স্থানটা দুর্ভেদ্য বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাই এই পরিণাম।

পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ভাঙাচোরা সন্ধানী আলো আর একগাদা হাউই। রাতের অন্ধকারে শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা এইগুলিই বারবার পণ্ড করিয়াছে! স্থানটি দখলে আসিবার পর উহা ধ্বংস করিয়া আমাদের সৈনিকেরা প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি মিটাইয়াছে।

ক্রমেই মৃতের সমাধি-ফলকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। নান্‌শান্ হইতে কিন্‌চু পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। এক জায়গায় একটি আলগা মাটির ঢিপি, তার উপর একখণ্ড বাঁখারি পোঁতা। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য পা দিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—পায়ের তলায় এক

রুশের মৃতদেহ! মৃতদেহ কখনো মাড়াই নাই—সেদিনকার সে-আতঙ্ক এখনো মনে পড়ে। যুদ্ধে তখনো নামি নাই, তাই যুদ্ধের শোকাবহ পাপপূর্ণ পরিণাম দেখিয়া শিহরিত হইলাম!

এখন ভাবিলে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়। চলন্ত গোলাগুলির সাম্‌নে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে যুদ্ধের আতঙ্ক কমিয়া আসে—গোড়ায় যা বীভৎস, পীড়াদায়ক মনে হয়, তার প্রতি মন উদাসীন হইয়া ওঠে। অতিপরিচয়ের ফলে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়—নহিলে যুদ্ধের ধকল সহিয়া কে বাঁচিতে পারিত?

## শত্রুর চর

য়েন্‌চিয়াতুন হইতে চুংচিয়াতুন বেশিদূর নয়, কিন্তু 'মার্চ্' করার কথা মনে হইলেই সেই পথের কথা না ভাবিয়া পারি না। পোর্ট্-আর্থারের আশপাশের ভূমি কেবল পাথরে ও নুড়িতে ভরা। অন্যত্র সবই মাটি—চালের কুঁড়ো বা ছাইয়ের মত। প্রবল বাতাসে সেই ধূলা উড়িয়া কণ্ঠরোধের উপক্রম করে—সর্পাকৃতি চলন্ত সৈন্যশ্রেণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অনেক সময় এতটুকু সম্মুখে দৃষ্টি চলে না—পদে পদে সৈনিকের ছোড়ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। ব্যাপার এমন যে, খাবারের কৌটার মধ্যে ভাত পর্য্যন্ত ধূলায় ভর্ত্তি হইয়া যাইত।

অন্য সময়ে দশ বিশ ক্রোশ বা ততোধিক পথ দিনরাত অবিরাম চলিয়া অতিক্রম করিয়াছি, দশ ক্রোশ হয়ত ছুটিয়াই গিয়াছি। কখনো পানীয় বিনা, কখনো গভীর অন্ধকারে চলিয়াছি—কিন্তু এই ধূলার উপর দিয়া 'মার্চ্' করার কষ্টের তুলনায়, সে-সব অভিজ্ঞতা নগণ্য। আসল

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার যে সম্মান, তাহা লাভ করিবার এই যদি মূল্য হয়, তবে নিশ্চয়ই সে মূল্য আমরা দিয়াছি। পরিশ্রম ও কষ্টের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু মন যখন বর্ষাফলক ও গোলাগুলির অপেক্ষায় আছে তখন প্রকৃতির সহিত এই দ্বন্দ্ব বড়ই যন্ত্রণাদায়ক—যেমন জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করা, পাহাড়ে চড়া, বৃষ্টি বাতাস শীতাতপের সহিত সংগ্রাম আর তৃণশয্যায় শয়ন! ক্রমে আমরা ভাবিতে সুরু করিলাম, ইহাও যুদ্ধেরই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। শেষে এমন হইল, ভুট্টাক্ষেতে বা শিলাশয়নে শুইয়াও নিদ্রা উপভোগে ব্যাঘাত ঘটিত না। মুক্ত আকাশ-তলে চাঁদের পানে চাহিয়া পতঙ্গগুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ভুলিয়াই যাইতাম যে, আমরা প্রাসাদ বা দুর্গকক্ষে সুখশয্যায় শুইয়া নাই।

অবিরাম 'মার্চ' করিয়া চুংচিয়াতুন পৌঁছিবার পর তৃতীয় ডিভিসনের সৈন্যদল অবসর পাইল। তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের অনভিজ্ঞতায় ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সেখান থেকে সরিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচি—নান্‌শানের কীর্ত্তির পর তারা যেন মহিমার মুকুট পরিয়াছে! মনে হইল, আমরা গেঁয়ো লোক, ট্রেন 'মিস' করিয়া ইঞ্জিনের বিলীয়মান ধূমধারার পানে বোকার মত হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছি! তাদের উপর হিংসা হইতে লাগিল—কল্পনায় দেখিতে পাইলাম তাদের পোষাক ছিন্নভিন্ন রুধিরাক্ত, তাদের অঙ্গে সম্মানের তাজা ক্ষতচিহ্ন! শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে তাদের পানে চাহিলাম—মনে মনে তাদের ধূলিমলিন টুপি ও রক্তমাখা পট্টির কত তারিফ করিতে লাগিলাম। চাহনি, ভাবভঙ্গী, সমস্তের মাঝ থেকেই যেন তাদের মহান কীর্ত্তির পরিচয় উঁকি দিতেছে!

শত্রুর সামনে এক পাহাড়। আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যদেশ যেখানে তারই দক্ষিণে উহা দাঁড়াইয়া। আন্তজুয়ান পাহাড় হইতে তাইৎজুয়ান

পাহাড় পর্য্যন্ত, প্রায় আট ক্রোশ ব্যাপিয়া জাপানী দলের বিস্তার। মাঝে মাণ্ডতুংজু গিরিসঙ্কট। তারই মাঝামাঝি এক জায়গায় আমরা আছি।

এই গিরিসঙ্কটের উত্তরে লিটিয়াতুন গ্রাম। আমাদের নিজেদের দল দক্ষিণে এই গ্রাম হইতে নদীর ওপারে য়ুটিয়াতুন গ্রাম পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তারপরে শৈলশ্রেণী। সেখানে সুদৃঢ় বাধা তুলিয়া, শত্রুর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে জেনারেল নোগি দলবল সহ ডাল্‌নির প্রায় চার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। তাঁর পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় "আর্ম্মির' সংগঠন সম্পূর্ণ হইল।

শত্রু নান্‌শানে পরাজিত হইলেও ডাল্‌নি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাদের ছিল না, কিন্তু কি করে, প্রাণের দায়ে স্ত্রী পুত্র লইয়া পোর্ট-আর্থার অভিমুখে পালাইতে হইল। যাইবার পথে তারা শানশিলি-পাও গ্রাম পুড়াইয়া দিয়া গেল।

সন্ধানী দূত খবর দিল—শত্রুপক্ষ পান্তন, লুয়ান্নি-চিয়াও, ওয়াইতু, উয়াস্তিং প্রভৃতি পাহাড়ের যোগসাধন করিয়া সেই স্থান সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিয়াছে। রুশ ও জাপানী সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার 'মিটার' *।

প্রথম দিনই খন্তা ও কোদাল লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিলাম। এক একটি জায়গায় এক এক অশ্বারোহী বা পদাতিক দল নিযুক্ত হইল। দিন রাত 'ট্রেঞ্চ' বা খাত কাটা চলিতে লাগিল। সৈনিকেরা তার মধ্যে ওৎ পাতিয়া থাকিবে। এ কাজে কর্ম্মচারীরা হইল সর্দ্দার, আর সৈনিকেরা হইল কুলি। ওদিকে কাঁচা পাকা সেনানায়কেরা চরের কাজে বহাল হইয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

---

* এক মিটার এক গজ অপেক্ষা ইঞ্চি তিনেক বড়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। প্রথম প্রতিবন্ধক —'ট্রেঞ্চ' ও অশ্বারোহীদের জন্য বোমানিবারক দেওয়াল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ডাল্‌নি হইতে আমদানি বোরার মধ্যে বালি ভরিয়া, সেই বোরা স্তূপাকারে সাজাইয়া এই দেওয়াল বা আড়ালের সৃষ্টি। অশ্বারোহী থাকিবে প্রথমে। তারপর যারা ওৎ পাতিয়া থাকিবে তাদের জন্য খাতের ব্যবস্থা। সাদাসিধা ধরণের তারের বেড়া খাড়া হইল, একটা ভাল রাস্তাও তৈরি হইল। এই রাস্তা হইতে মাকড়সার সূতার মত নানা সরু সরু ফেঁকড়ি পথ বাহির হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলকে পরস্পর সংযুক্ত করিল। সৈন্যেরা হয় পল্লী-বাসীদের সহিত তাদের গৃহে, নয় প্রাঙ্গণে বা গাছের তলায় তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতে লাগিল।

শত্রুর আক্রমণে যারা বাধা দিবে, রাত্রে তাদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার জো নাই. শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার উপায় নাই। রাত্রি-কালেই সবিশেষ সজাগ ও হুঁসিয়ার থাকা প্রয়োজন। সৈন্যশ্রেণীর কাছাকাছি থাকে শান্ত্রী, সামনে দূর পর্য্যন্ত থাকে চর, সব-কিছুর উপরেই তাদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। সারাদিন পরিশ্রমে যতই শ্রান্ত হউক, রাত্রে এমন সজাগ থাকিতে হয় যাহাতে একটি সরব পতঙ্গ বা উড়ন্ত পাখীও তাদের দৃষ্টি এড়াইতে না পারে! ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্বাস রোধ করিয়া খুব সতর্কতার সহিত চোখ কান ব্যবহার করিতে হয় পিছনের সমস্ত সেনাদলের জন্য।

"কে যায়? দাঁড়াও!"

শান্ত্রীর এমনি চীৎকার রাত্রির উদ্বেগ ও নির্জ্জনতা বাড়াইয়া তোলে। সহসা অন্ধকারে দু'একবার বন্দুকের আওয়াজ হয়—হয় ত শত্রুর চর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার সমস্ত নীরব। রাত বাড়িয়া চলে। পুঞ্জ

পুঞ্জ কালো মেঘ উত্তর হইতে যাত্রা করিয়া অচিরে সারা আকাশে কালি লেপিয়া দেয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হয়।

আক্রমণ-প্রতিরোধের বন্দোবস্ত প্রায় সম্পূর্ণ, এমন সময় শত্রু মাথা তুলিতে সুরু করিল। শান্ত্রীশ্রেণীর নিকটে প্রতি রাত্রেই বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

অবিরাম খবর আসিতেছে—অমুক জায়গায় জন পাঁচ ছয় শত্রুর পদাতিক চর দেখা দিয়া তখনি উপত্যকার মধ্যে অদৃশ্য হইল। তাদের ধরিবার জন্য রকমারি ফাঁদ উদ্ভাবন করিতে সুরু করিলাম। এমন একটি ফাঁদের কথা বলি। আমাদের এলাকা হইতে কিছু দূরে এক গাছা দড়ি দুই প্রান্তে দুই খোঁটায় মাটির উপর টানিয়া বাঁধা হইল। সেই দড়ির সঙ্গে অপর একগাছা দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া, অন্য প্রান্ত শান্ত্রীর পায়ের কাছে আটকান রহিল। চলার সময় শত্রুর পা প্রথম দড়িতে লাগিলে তার কম্পন দ্বিতীয় দড়ি বাহিয়া শান্ত্রীর নিকট পৌছিবে। তখন শান্ত্রী ছুটিয়া গিয়া শত্রু-চরকে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

একদিন সঙ্কেত পৌছিল—শিকার জালে পড়িয়াছে। শান্ত্রীদল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখে—মানুষের টিকিও নাই, কেবল একটা মস্ত কালো কুকুর আকাশপানে চাহিয়া দাঁত খিঁচাইয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে!

৭

## প্রথম বন্দী

একদিন লেফটেন্যাণ্ট তোকি জন কয় সৈনিক লইয়া লুয়ান্নি-চিয়াওর আশপাশে শত্রুসন্ধানে বাহির হইলেন। শত্রুর দেখা মিলিল না, তাই পশ্চাতে প্রহরী দাঁড় করাইয়া ফিরিতে সুরু করিলেন। এ হেন সময়ে

তাঁর দল ও পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রহরীদলের মধ্যে দুইজন রুশচরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। জাপানী সৈনিকের বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়াও তারা বশ্যতা স্বীকার করিল না—কিরিচ লইয়া রীতিমত লড়াই সুরু করিয়া দিল। অবশেষে গুলির ঘায়ে আহত হইয়া তারা যখন ধরাশায়ী হইল, তখন দেখা গেল, আঘাত গুরুতর হইলেও তখনো প্রাণ বাহির হয় নাই।

এই আমাদের প্রথম বন্দী। তাদের প্রশ্ন করিবার জন্য সকলে অধীর হইয়া উঠিল। অবিলম্বে খড়ের মাদুর তৈরি হইয়া গেল, তার উপর দুজনকে শোয়াইয়া একটি জলধারার পাশে আনা হইল। সেখান থেকে আমাদের ছাউনি বেশি দূর নয়।

বন্দী শত্রু দেখিবার আগ্রহে সৈনিকেরা চারিধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দোভাষী সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া পৌছিলেন, দুই বন্দীকে দুই জায়গায় রাখিয়া পরীক্ষা সুরু হইল।

সাধ্যমত শুশ্রূষান্তে ডাক্তারেরা প্রবোধ দিয়া বলিল, চিন্তা নেই, আমরা তোমাদের দেখাশুনো করবো! এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও দেখি!

ডাক্তারেরা আমাদের জানাইল, গুলি দুজনেরই বুক ভেদ করিয়াছে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক বাঁচিতে পারে! জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল!

প্রশ্ন হইল—তোমার কোন্ রেজিমেণ্ট আর কোন্ দল?

বন্দী বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, Infantry Sharp-shooters ২৬ নম্বর রেজিমেণ্ট।

"বেশ। তোমাদের দলের নায়ক কে?"

"জানি না।"

দোভাষী তাহাকে বুঝাইতে লাগিল—জানি না বলো কেন? নিজের নায়কের নাম তোমার জানা উচিত!

বন্দীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে মিথ্যা কহিতেছে। তার মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল, শ্বাসপ্রশ্বাসেও কষ্ট হইতে লাগিল।

সে জল চাহিল।

আমি তার পাশেই ছিলাম। ঝর্ণা থেকে এক গ্লাস জল ধরিয়া তাহাকে দিতে গেলাম। নেওয়া দূরের কথা, সে ফিরিয়াও তাকাইল না।

"আমার বোতলে ফোটানো জল আছে, আমাকে তাই দিন!"

তাই করিলাম। জানি না, সেই রুশ সৈনিক আসন্ন মৃত্যুকালেও শত্রুর-দেওয়া জল পান করিতে ঘৃণা বোধ করিল কি না! তবে কাঁচা জল পান না করিয়া স্বাস্থ্যবিধি পালনের যে-আগ্রহ সে দেখাইল, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্যই আহত না হওয়া পর্যন্ত সে জাপানীদের সঙ্গে নির্ভয়ে যুঝিতে পারিয়াছিল।

এই রুশ সৈনিকটিই যে কেবল তার নায়কের নাম জানিত না, তা নয়। পরে অনেক বন্দীকেই প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়াছি অধিকাংশই সমান অজ্ঞ। কিসের জন্য বা কার জন্য যে তারা লড়িতেছে, তা-ও তারা জানিত না। দশ জনের মধ্যে ন-জন বলিত, তাড়ার চোটে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে—কেন, কি বৃত্তান্ত, অতশত বোঝে না!

বন্দীকে রেহাই দেওয়া হইল। ক্রমেই সে সাদা হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, কষ্ট হচ্ছে কি? কিছু বলতে চাও?

সহানুভূতির কথায় বন্দীর চোখে জল আসিল। মাথাটা একটু

তুলিয়া সে কহিল, দেশে স্ত্রী-পুত্র রেখে এসেছি। তাদের জানাবেন, কেমন ক'রে আমার মৃত্যু হ'ল।

অপর বন্দীটি ভিন্ন প্রকারের। দোভাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার রেজিমেণ্ট এখন কোথায় ?

সে কতকটা এইরূপ উত্তর দিল—

"চোপ রও! জানি না আমি! জাপানীরা ভারি নিষ্ঠুর! যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের প্রতি লেশমাত্র দয়া নেই! আমাকে 'স্প' দাও, চুরট দাও!"

নান্‌শানে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াও রুশেরা বুঝে নাই জাপানী-দের যথার্থ কৃতিত্ব কোথায়। পোর্ট-আর্থারের তথাকথিত অজেয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তারা খর্ব্বকায় শত্রুকে হেয়জ্ঞান করিয়াছিল। কূপমণ্ডুকের মত তাদের অবস্থা। চিউলিয়েন্‌-চেঙে আমাদের বিজয়-বার্ত্তা তারা শোনে নাই, রুশেরা কোরিয়া হইতে নিঃশেষে বিতাড়িত হইয়াছে তাও জানে না। এসব কথা শুনিয়াও তারা বিশ্বাস করে নাই।

শত্রুর আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা দিনরাত চলিতেছে। একবার একটা বড় দল শত্রুসন্ধানে বার হইয়া একদল অশ্বারোহী রুশসৈন্যের মুখোমুখি পড়িয়া যায়। শত্রুপক্ষের অনেকে নিহত হইল। জাপানীরা তাদের ঘোড়াগুলি ধরিয়া লইয়া আসিল।

রুশেরাও আমাদের উপর অবিরাম লক্ষ্য রাখিয়াছিল। দূরে ওয়াইতু-যান্‌ গিরিশিরে দূরবীন্‌ হাতে লইয়া কালো পতাকা নাড়িয়া শান্ত্রীরা সর্ব্বদাই ইসারা করিতেছে দেখিতে পাইতাম। কখনো কখনো তারা আমাদের অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীর উপর নজর রাখিবার জন্য চীনাসাজে গুপ্তচর পাঠাইত। প্রথম প্রথম তাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই—অসতর্কতার ফলে কয়েকজন জাপানী প্রহরী নিহত হয়। পরে আমরাও সাবধান

হইলাম—এমন কি আসল চীনাদেরও আমাদের এলাকায় আসিতে দিতাম না। একবার সমুখের গ্রামের চীনা 'মেয়র' জাপানী এলাকায় প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। এই নিয়মে তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে, জানাইলেন। তখন জাপানী কর্তৃপক্ষ একটি বিশিষ্ট কমিটির হাতে এরূপ ব্যক্তিগত ব্যাপারের তদন্তের ভার অর্পণ করেন। ফলে, যাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন এলাকার মধ্যে বাস করে, কেবল তারাই প্রবেশের অনুমতি পাইল।

এইরূপে আসল যুদ্ধের আয়োজনে নিরত থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সামরিক কারণে কিছুকাল গায়ে পড়িয়া আক্রমণ না করিয়া, সে-কাজ শত্রুকে করিতে দেওয়া হইল। যাহাতে তারা অতর্কিত আক্রমণ করিতে না পারে, কেবল ততটুকু সাবধানতা আমরা অবলম্বন করিলাম। ইত্যবসরে শত্রুর রণপোত সিয়াওপিং-তাও এবং হেইসি-চিয়াওর নিকটে আবির্ভূত হইয়া এলোপাতাড়ি গোলা ছুড়িয়া আমাদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

৮

## ওয়াইতুষানের যুদ্ধ

মাসাবধি কাল আটঘাট বাঁধিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি। শত্রুর সহিত অবিরাম খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। শত্রু আছে অনেকগুলি উঁচু পাহাড়ে, আমরা আছি নীচে। সুতরাং আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা তাদের পক্ষে সহজ। শত্রুকে এই সুবিধা দেওয়া আর উচিত নয়।

পাহাড়গুলির নাম ওয়াইতুষান্ ( উচ্চতা ৩৭২ 'মিটার' ) শুংতিং-

যান্ ( দুই চূড়াবিশিষ্ট, উচ্চতা ৩৫২ 'মিটার' ) আর একটি অনামা পাহাড়। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম কেন্‌জান বা 'খড়্গগিরি', সেটি প্রথম দুইটির চেয়ে উঁচু এবং দুরারোহ। এই-সব পাহাড় আমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ। সেখানে ভালো ভালো দূরবীন্ বসাইয়া শত্রুপক্ষ আমাদের ছাউনি, তালিয়েন্ উপসাগর ও ডাল্‌নিতে কি ঘটিতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। ইহা আমাদের একটা মস্ত অসুবিধা। ঐ সব জায়গা যতদিন শত্রুর হাতে থাকিবে, ততদিন আমাদের পিছনে যুদ্ধের আয়োজন হইবার জো নাই, হয়ত অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিবার সুযোগও হারাইতে হইবে! অতএব স্থানগুলি অবিলম্বে দখল করা দরকার। তা ছাড়া সিয়াওপিং-তাও লইতে হইবে, যাহাতে শত্রুর জাহাজ তালিয়েন্-উপসাগরে হানা দিতে না পারে। ওয়াইতুযানে আমাদের প্রথম যুদ্ধের ইহাই কারণ।

এ যুদ্ধ কিছু মারাত্মক নয়—ঐ সব পাহাড় থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুদৃঢ় স্থান—তাই রুশেরা উহা রক্ষার বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত করে নাই। সে-স্থান আক্রমণ করা তাই তেমন কঠিন ছিল না। আমাদের কিন্তু ইহাই প্রথম যুদ্ধ, তাই প্রচুর উৎসাহ ও জেদের সহিত লড়িয়াছিলাম!

একদিন গোপন আদেশ পৌঁছিল—অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! তখন রাত অনেক, শিবিররক্ষীদের আগুন নিবিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে গাধার ডাক রাত্রির নির্জ্জনতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। মাঝরাতে এ আদেশ আসিল কেন?—চীনাদের ভয়ে। স্থির ছিল পূর্ব্বদিন আক্রমণ হইবে, কিন্তু যাত্রার আয়োজন সুরু হইবার পর সন্দেহ হইল যে, চীনারা শত্রুপক্ষের কাছে আমাদের অভিসন্ধি ফাঁস করিয়া দিয়াছে। অগত্যা সেদিন আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া পরদিন

প্রত্যূষে করাই স্থির হইল। চীনারা টের পাইবার আগেই যাত্রা সুরু করিতে হইবে!

সে-রাত্রে উত্তেজনায় ঘুম আসিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে আসন্ন যুদ্ধের কল্পনায় মন ভরিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে পাশের শয্যায় শায়িত সৈনিকের সঙ্গে যা তা আবোল-তাবোল বকিতে লাগিলাম। অন্ধকারে ইতস্তত ছোট ছোট আগুনের ঝিলিক চোখে পড়িতেছে। বুঝিলাম অনেকেই জাগিয়া আছে এবং সিগারেট টানিতে টানিতে আমারই মত হয়ত কত কি ভাবিতেছে!

অচিরে শিবিরের সর্ব্বত্র একটি নীরব চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। সৈনিক ও নায়কেরা দ্রুতগতি শয্যাত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁবু ও ওভারকোট পাট করিতে সুরু করিল। অতি সাবধানে ক্যাঁচকেঁচে চামড়ার বোঁচকা (knapsack) আঁটিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘাসের উপর দিয়া এক জায়গায় গিয়া জড়ো হইলাম। বন্দুকগুলি গাদা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কালির মত কালো—অন্ধকারে কেবল কিরিচ ও টুপির উপরকার ধাতুময় তারাগুলি চকচক করিতেছে। নয়ন নিদ্রালস ও নিষ্প্রভ হইলেও সৈনিকদের চিত্তে দৃঢ়তা ও অধীরতার অভাব নাই! চাপাস্বরে কথা চলিতেছে—কিছু ফেলিয়া আস নাই ত?' সব আগুন নিবিয়াছে?

সহসা সকলে নির্ব্বাক হইল। "নিঃশব্দে চলো"—এই আদেশ পাইয়া তারা চলিতে সুরু করিল। গ্রামসীমা না ছাড়ানো পর্য্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে হইল—যাহাতে চীনারা না জানিতে পারে, প্রভাতে উঠিয়া আমাদের না দেখিয়া যেন অবাক হইয়া যায়! একমাস গ্রামে ছিলাম, ইহারই মধ্যে সেখানকার নদী গিরি প্রান্তর পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাদের উপর মায়া পড়িয়া গেছে, গ্রামখানি গৃহের মত হইয়া

উঠিয়াছে। এতদিন যে তরু আশ্রয় দিল, যে জলধারা তৃষ্ণা মিটাইল, তাদের প্রতি উদাসীন হই কিরূপে ?

পল্লীবাসীদের মধ্যে এক বুড়া ছিল—তার নাম চ্যাং-তিন্‌শিন্। লোকটি আমাদের অনেক সেবা করিয়াছে, সকালে জল তুলিয়াছে, সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়াছে। কেমন করিয়া টের পাইয়াছিল আমরা যাইতেছি—সারা রাত সে আমাদের কাজ করিল, তারপর গ্রাম অন্তে আসিয়া আমাদের বিদায় দিয়া গেল। বেচারা! তাহাকে আজও ভুলিতে পারি নাই।

ভোরের কুয়াসায় আকাশ আচ্ছন্ন—সূর্য্যোদয় এখনো হয় নাই। সুদীর্ঘ সৈন্যশ্রেণীশীর্ষে সূর্য্য-পতাকা উড়িতেছে। দক্ষিণে বহু দূরে কয়েকটা আওয়াজ হইল—যুদ্ধ সুরু হইল না কি ?

ঠিক সেই সময় আমাদের দলের দক্ষিণ ও বাম বাহু ( column ) যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দক্ষিণ বাহু পান্‌তুগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমের পাহাড় আক্রমণ করিবে, আর বাম বাহু আক্রমণ করিবে লুয়ান্নিচিয়াও পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের গিরিশীর্ষে শত্রুর ঘাঁটি।

আমরা বাম বাহুর মাঝের অংশ—আমরা আক্রমণ করিব ওয়াই-তুষান্। ঘোড়ার জিভ বাঁধিয়া, পতাকা মুড়িয়া, অস্ত্রাদি নীচু করিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম। কাছাকাছি পৌঁছিতে শত্রুপক্ষ উপর হইতে খুব এক চোট গুলিবর্ষণ করিল। প্রবল বাধার মুখে আমরাও তাদের দিকে গুলি চালাইতে লাগিলাম। তারা উপরে আমরা নীচে, তাদের গোলাগুলি আমাদের মাথায় বৃষ্টিধারার মত পড়িতে লাগিল—আমাদের পায়ের কাছে ধূলা উড়াইল। এত দিনে আমাদের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠিল !

সময় যতই যাইতেছে, গোলাগুলির আনাগোনা ততই বাড়িতেছে

—ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। নির্ধূম বারুদের বিস্ফোরক গ্যাসের দুর্গন্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া গেল। বন্দুকের টোটার কামরা খোলা ও বন্ধ হওয়ার এবং খালি টোটা ছিটকাইয়া পড়ার শব্দ, গুলির গুমরানি, গোলার চাপা গর্জ্জন এবং আঘাতের পর ফাটিয়া পড়া—অতি অপূর্ব্ব, রক্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। দিকে দিকে 'আগে চলো, আগে চলো' ধ্বনি। খাড়া পাহাড়, খড়্গের মত পাথর, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদল দ্রুতপদে অধীর আগ্রহে উঠিতেছে। বন্ধনীর মধ্যে টোটাগুলা খড় খড় করিতেছে, চলার ছন্দে তলোয়ার খাপ হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, চিত্ত যেন নাচিতেছে! চলো আর গুলি চালাও, গুলি চালাও আর চলো! শত্রুর গুলি বৃষ্টিধারার মত নীচে নামিতেছে আর আমাদের গুলি হাউইয়ের মত শূন্য ভেদিয়া উপরে উঠিতেছে। যুদ্ধ ভীষণ হইয়া উঠিল।

শত্রুশ্রেণীকে যতক্ষণ না গোলাগুলি দিয়া বিদীর্ণ করা যায় ততক্ষণ গুলি চালাইয়া তাদের ব্যতিব্যস্ত করা দরকার। যুদ্ধে কামানের কাজও যথেষ্ট, যদিও যুদ্ধ শেষ করিতে হয় কিরিচ দিয়া। গুলি চালাইতে হয় খুব সাবধানে। যুদ্ধ একবার সুরু হইলে উত্তেজনায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে, কাণ্ডজ্ঞান হারাইবার অবস্থা হয়, কিন্তু তা হইলে চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা খুব কঠিন, তবুও ধীরেসুস্থে টিপ করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টানিতে হয়। যতই সোরগোল হোক, রক্তস্রোত যতই কেন বহিতে থাকুক, তবুও বিচলিত হইবার জো নাই!

"শীতের রাতে যেমন করিয়া হিম পড়ে তেমনি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বন্দুকের ঘোড়া টানিয়ো"—কবিতায় এই শিক্ষা পাই! এমনি করিয়া সজ্ঞানে অবিচলিত হাতে গুলি চালাইলে লক্ষ্যভেদ হইবেই।

যোদ্ধাদের উদ্যম ও আগ্রহ ক্রমে বাড়িয়া চলিল—যুদ্ধও জমিয়া উঠিল। আহতের সংখ্যা প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতেছে। 'আ!' বলিয়া

আর্ত্তনাদ, তারপরই গুরুভার পতন শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি একেবারে অজ্ঞান।

শেষ সুযোগ দ্রুতগতি আসিতেছে, শত্রু টলিতে সুরু করিয়াছে। এক পা আগে, এক পা পিছনে—তাদের মনমরা অবস্থা। হুঙ্কার দিয়া শত্রুর প্রতি ধাওয়া করার এই অবসর। সহসা যেন শত বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, পাহাড় ও উপত্যকা, আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, আমাদের নায়ক কাপ্তেন মুরাকামি সুদীর্ঘ অসি আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সৈনিকেরা চকিতে শত্রুশ্রেণী বিদীর্ণ করিল—লম্ফঝম্প করিয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে। প্রাণের দায়ে শত্রু পিছন ফিরিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া দৌড় দিল—অস্ত্রশস্ত্র, টুপি, টোটা প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া।

ওয়াইতুযান্ দখল হইল। আটটার সময় 'বানজাই' ধ্বনিতে সকালের আকাশ কাঁপিতে লাগিল।

৯

## কেন্‌জান্

ওয়াইতুযান্ স্বচ্ছন্দে দখল করিয়া জাপানীদের সাহস বাড়িয়া গেল। দীর্ঘ অপ্রশস্ত পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া তারা পলায়নপর শত্রুকে তাড়া করিল। কেন্‌জান্ বা "৩৬৮ মিটার পাহাড়" আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য। তাদের উৎসাহ অসীম—এক চালেই বাজিমাত্ করিবার আশা।

কেন্‌জান্ শিলাময় অতি বন্ধুর দুরারোহ গিরিচূড়া। সেখানে উঠিবার একটিমাত্র পথ আমাদের দিকে ছিল। সে-পথ এমন যে একটি মানুষ তার মাঝে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার লোকের ওঠা নামায় বাধা

দিতে পারে। গোড়ায় এ পাহাড়ের কোনো নাম ছিল না, আগেই বলিয়াছি। রুশেরা নাম দেয় "Quin Hill"। স্থানটি আমাদের দখলে আসার পর জেনারেল নোগি উহার নাম রাখিয়াছিলেন "কেন্‌জান্" বা "খড়্গগিরি"। প্রথমে জানিতাম না কত শত্রুসৈন্য সেখানে আছে—শুনিয়াছিলাম কিছু পদাতিক ও দশটি কামান মাত্র তাদের সম্বল।

আমাদের রেজিমেণ্টই ওয়াইতুযানের পাদদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া সাগরতীরাভিমুখে শস্যক্ষেত্রের মাঝে গিয়া থামিল। লিয়াওতুঙে তখন দারুণ গ্রীষ্ম—নিকটে মুখ ভিজাইবার মতও একটি জলধারা নাই। গ্রামের অন্তে গাছপালা, ঝোপঝাড়ের অভাবে একটু ছায়াও মেলে না। পদতলে একগাছা ঘাস পর্য্যন্ত নাই—সূর্য্যরশ্মি যেন জ্বলন্ত লৌহশলাকা—টুপি ফুঁড়িয়া আমাদের মাথা গলাইয়া দিবার উপক্রম করিল। মনকে বুঝাইলাম, এ নিদারুণ দাহ-যন্ত্রণা বেশিক্ষণ থাকিবে না—অচিরেই যুদ্ধে মাতিবার সুযোগ মিলিবে! কিন্তু বৃথা বৃথা! সকাল ন'টা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সমভাবেই কাটিয়া গেল। বামে বহুদূরে পূর্ব্বসাগরের বীচিবিক্ষুব্ধ বারিরাশি দেখা যাইতেছে। মনে হইতে লাগিল—আহা! যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরিবার আগে যদি একবার ঐ শীতল জলে ডুব দিতে পারিতাম!

কিছুক্ষণ পরে আমাদের বামদিকে সিয়াওপিং-তাও দ্বীপের নিকটে এক রুশ মানোয়ারি জাহাজ আসিয়া অচিরে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিল। ঊর্দ্ধ আকাশে ইতস্তত ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচিত হইতে লাগিল, বাতাসে একটা হুর্‌র্ ধ্বনি উঠিল—গোলার পর গোলা, শব্দের পর শব্দ। গোলা পাথরের উপর পড়িয়া স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে, চারিদিকে ধোঁয়া ছড়াইতেছে, টুকরা পাথর এদিক-ওদিক

ছুটিতেছে। নিরাপদে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু গোলার ঘায়ে ঘায়েল হইবার সাধ হয় না। অধিকাংশ গোলাই খুব কাছে পড়িলেও ভাগ্যক্রমে কেহই আহত হইল না। শীঘ্রই কেন্‌জানের দিক থেকে বন্দুক ও কামানের শব্দ আসিতে সুরু করিল। আক্রমণ তবে আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠিল।

যাত্রার আদেশ আসিয়াছে। ভারি চামড়ার বোঁচকা (knapsack) চটপট চলাফেরার বাধা। সকলে তাড়াতাড়ি এক একটা লম্বা থলির মধ্যে একদিনের আন্দাজ রসদ ভরিয়া পিঠে বাঁধিল, তারপর ওভারকোট কাঁধে ফেলিল। গোটা দুই তিন সিগারেট সংগ্রহ করিয়া তখনি রওনা হইলাম। দ্রুতগতি চলিবার বিশেষ কোনো আদেশ ছিল না, তবুও আমাদের চলার বেগ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল। যেদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ও কামানের গর্জ্জন আসিতেছিল সেইদিকে একটানা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম, যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল।

পৌঁছিয়া দেখি শত্রু-অধিকৃত পাহাড়টা আমাদের সমুখে প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। রুশেদের সহিত আমাদের প্রথম সৈন্যশ্রেণীর অবিরাম গোলাগুলি বিনিময় চলিতেছে। যুদ্ধের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহতের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে—আমাদের পিছনপানে তারা ঘনঘন বাহিত হইতেছে।

জাপানী গোলন্দাজেরা শত্রুর কামান থামাইবার খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। পদাতিকেরা একজনের পিছনে আর এক জন খাড়া পাহাড়ে কোনো গতিকে উঠিতে সুরু করিল। মাঝে মাঝে থামিয়া গুলি চালায়,

তারপর আবার একটু ওঠে, আবার থামে। আকাশ ব্যাপিয়া পাণ্ডুর মেঘ, সাদা ও কালো ধোঁয়া গাদাগাদা উঠিতেছে, মাটির উপর চড়বড় করিয়া গোলাবৃষ্টি হইতেছে। গোলন্দাজের হাত ভাল, অচিরে শত্রুর তিন চারিটি কামান নীরব হইয়া গেল।

আমাদের পদাতিকেরা শত্রুর খুব নিকটে পৌঁছিয়াছে এমন সময় দুইটা 'মাইন' তাদের সামনে ফাটিয়া গেল। কালো ধোঁয়া আর ধূলার মেঘের মধ্যে আমাদের লোকেরা অদৃশ্য হইলে ভয় হইল বুঝি-বা সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ধোঁয়া মিলাইলে দেখিলাম আমাদের একটি লোকও মরে নাই! তবে কি রুশেরা এত বহুমূল্য বারুদ নষ্ট করিল শুধু ধূলা উড়াইবার জন্য?

কেবল বিস্ফোরক 'মাইন' দিয়া নয়, বারবার একযোগে গুলিবর্ষণ করিয়া শত্রু আমাদের বাধা দিতে লাগিল। তাদের পানে মুখ ফিরানো দায়, আরামে মাথা তোলারও উপায় নাই। তবুও নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ছোট একটি দল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িল। অমনি সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বড় বড় দল বন্যার মত শত্রুর মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল। 'মাইন'এর মুখ মাড়াইয়া, সমুখ ও পাশের গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া এই আক্রমণ—তাহাতে কত যে বিপদ বুঝাইয়া বলা কঠিন।

কেন্‌জান-গিরি দৈববলে বলীয়ান, তাহাকে কি ছাড়া যায়? শত্রু প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল। যুদ্ধ ত নয় যেন সাক্ষাৎ নরক। বর্শার সঙ্গে বর্শা, তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ার মিলিল, ভীষণ কামানগর্জ্জনে ডুবিল যোদ্ধদলের হুঙ্কার ও আস্ফালন এবং আহতের সকরুণ বিলাপ; আকাশ ধূমাবরণে অদৃশ্য হইল। শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া

বিজয়লক্ষ্মী আমাদের আশ্রয় করিলেন। নানা পরাজয়-চিহ্ন পশ্চাতে ফেলিয়া শত্রু পালাইল।

শৈলশিরে নবসূর্য্য-পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছে। কেল্লা হাতে আসিয়াছে—শত্রুকে আর কি উহা ফিরাইয়া দিব?

১০

## পাল্টা আক্রমণ

কেন্‌জান হস্তগত হইবার পর শীঘ্রই শুয়াংতিংযান ও আশপাশের স্থানগুলি আমাদের দখলে আসিল। ধোঁয়ার মাঝ দিয়া দেখিলাম বিজয়ী সেনাদলের উপর জাপানী পতাকা উড়িতেছে। তাদের জয়ধ্বনি বায়ু ভেদিয়া আকাশে বজ্রনিনাদের মত উঠিতে লাগিল। শুয়াংতিংযান কেন্‌জানের মতই প্রয়োজনীয় অথচ সুরক্ষিত নয়, তাই বেশিক্ষণ যুঝিতে পারিল না। প্রাচীন প্রবাদ আছে—দলের একটি বুনো হাঁস ভয় পাইলে সমস্ত দলটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তেমনি একটি সৈন্যদল পিছু হটিলে সমগ্র বাহিনী পরাজিত হয়। কেন্‌জানের উপর রুশেদের খুব আস্থা ছিল। যেমনি তার পতন হইল অমনি শুয়াংতিংযান ও সিয়াওপিংতাও শুকনো পাতার মত ঝরিয়া পড়িল।

যে-উচ্চতা হইতে শত্রু এতদিন আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত, এখন সেখানে আমরাই দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। এমন জায়গা যে রুশেরা আবার দখল করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই। শোনা যায়, রুশ জেনারেল ষ্টেসেল* তাঁর সমগ্র

---

* পোর্ট-আর্থারে রুশেদের প্রধান সেনাপতি।

সৈন্যবাহিনীকে, যেমন করিয়া হোক কেন্‌জান্‌ পুনরধিকার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কারণ পোর্ট-আর্থার রক্ষায় কেন্‌জান্‌ অপরিহার্য্য। আমরাও পণ করিয়াছিলাম, শত্রুকে কিছুতেই সে-স্থান ছাড়িয়া দিব না। তাদের মত আমরাও চরম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত!

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন শেষ হইল—সূর্য্য অস্ত গেল। যুদ্ধশেষে নিরানন্দ ধূসর আলোয় আকাশ ও ধরণী ঢাকা পড়িল। শোণিতাক্ত তৃণপুঞ্জের উপর দিয়া অস্বস্তিকর তপ্ত হাওয়া বহিতে লাগিল। ক্ষণেক পূর্ব্বের রণতাণ্ডবের পর আসিল ভয়াবহ গভীর স্তব্ধতা, মাঝে মাঝে কেবল দু-চারিটা বন্দুকের শব্দ—ছাড়াছাড়া, নিস্তেজ, পরিশ্রান্ত। মনে হইল, এমনি করিয়া এলোমেলো গুলি চালাইয়া পরাজিত শত্রু তার দুঃখ ও ক্রোধের ভার লাঘবের চেষ্টা করিতেছে! সহসা গিরিশিখর কালো মেঘপুঞ্জ উদ্‌গার করিতে লাগিল, নিমেষে সারা আকাশ কালির-মত হইয়া গেল—বিদ্যুৎ ও বজ্রের পর ক্ষিপ্রবেগে বৃষ্টি নামিল বন্দুকের গুলির মত! কিছু পূর্ব্বে মানুষ যে মারাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, প্রকৃতি যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি সুরু করিয়া দিল। বিরূপ প্রকৃতির এই যুদ্ধ সৈনিকদের কষ্ট আরও বাড়াইয়া তুলিল—একটা গাছও নাই যার তলে আশ্রয় মিলিতে পারে! দেখিতে দেখিতে সকলের মূর্ত্তি হইল যেন জলে-ডোবা ইঁদুর! বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের উপর রাত কাটিল—শুনিতে লাগিলাম তলায় ঘোড়াগুলা হাঁকডাক করিতেছে।

ভয়ানক যুদ্ধের পর সাধারণত একটা খুব ঝড় বা বৃষ্টি হয়। যুদ্ধ খুব জমিলে আকাশ বারুদের ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া ওঠে—চারিদিক ভারি নিরানন্দ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, অচিরে কানে তালা দিয়া বজ্র হাঁকিয়া ওঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে বৃষ্টি নামিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের

সমস্ত মলিনতা ধুইয়া দেয়। এমনি বর্ষণকে বলে—"বিজেতার জন্য আনন্দাশ্রু আর পরাজিতের জন্য শোকাশ্রু।" এমনি দুর্য্যোগের রাত বেহাত জায়গা পুনরধিকারের চেষ্টার উপযুক্ত সময়। আমরা কিন্তু যুদ্ধ-জয়ের পরও অসতর্ক হই নাই—বজ্রগর্জ্জনে বা বারিবর্ষণে ঢিলা দিবার পাত্র আমরা নয়। সূচনামাত্রেই শত্রুর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পণ্ড করিতে লাগিলাম।

কেন্‌জান ও শুয়াংতিংযান অধিকারের সাত দিন পরে একদা মধ্যাহ্নে শত্রু পাল্‌টা আক্রমণ সুরু করিল। আট নয় শত পদাতিক ওয়াংচিয়াতুন হইতে সিধা অগ্রসর হইতে লাগিল, আর তাষিতুঙের আশপাশ হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। ব্যাপার অপ্রত্যাশিত নয়—আমরা বিস্মিত হইলাম না। তাদের পানে আমাদের সমস্ত বন্দুক ও কামান দাগা সত্ত্বেও তারা নির্ভয়ে দ্রুতগতি সম্মুখে ধাবিত হইল—কিন্তু অধিকক্ষণের জন্য নয়। আমাদের প্রত্যেক "ভলি"র পর শত্রু দলে দলে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাদের নায়ক দীর্ঘ তরবারি শূন্যে ঘুরাইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—সে-ও পড়িয়া গেল। দেখিয়া অবশিষ্ট সৈনিকেরা রণে ভঙ্গ দিয়া উপত্যকার মধ্যে এলোমেলো ছুটিয়া পালাইল।

গোলন্দাজেরা কিন্তু অত সহজে নিরস্ত হইল না! আরও কিছুকাল তারা আমাদের পানে গোলা চালাইতে লাগিল। শেষে, বোধ করি পলায়নপর পদাতিক দলকে দেখিয়া নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। চারিদিক আবার নীরব—কেন্‌জান্ পুনরধিকারের প্রথম চেষ্টা সফল হইল না!

ইহার কিছুকাল পরে রুশেরা তাইপোষানের উপরে দেখা দিল। প্রথম আক্রমণে যত ছিল, এবারও প্রায় তত পদাতিক সানন্দে 'ব্যাণ্ড' বাজাইয়া আমাদের প্রথম 'লাইনের' পানে অগ্রসর হইল। দুই দলের

মধ্যেকার ব্যবধান যখন ৭০০-৮০০ 'মিটার' * মাত্র তখন তারা "উলা" গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল। অমনি আমরা ঘনঘন গুলিবর্ষণ সুরু করিয়া দিলাম। ফলে, অগ্রগামীরা ত মরিলই, যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, তারাও মরিল। অবশেষে শত্রু তাইপোষানের দিকে ফিরিয়া গেল।

পরদিন রাত একটায় অন্ধকারে কেন্‌জান্ আবার আক্রান্ত হইল। আক্রমণ যেমন দ্রুত তেমনি সুচিন্তিত—রুশেরা মৃত্যু পণ করিয়া আসিয়াছিল। তারা এমন নিঃশব্দে খাড়া পাহাড়ে হামা দিয়া উঠিয়াছে যে, একখানা পাথর বা নুড়িও স্থানচ্যুত হয় নাই। অতর্কিতে জাপানী শান্ত্রীকে বধ করিয়া সদলবলে তারা আমাদের শিবিরের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গভীর অন্ধকার—শত্রু-মিত্র চিনিবার জো নাই, তার মাঝে ভীষণ যুদ্ধ। কে যে কাহাকে মারিতেছে জানে না, তবুও সকলে তলোয়ার চালাইতেছে। কিছুই দেখা যায় না, শুধু আততায়ীর পতন শব্দ কানে পৌছিতেছে। রুশেরা এবারেও আমাদের বাধা ভেদ করিতে পারিল না—হতাশ হইয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত পাহাড় হইতে নামিয়া গেল। আহত অবস্থায় যারা পড়িয়া রহিল, তারা কিন্তু যথাসম্ভব বন্দুক ও তলোয়ারের সাহায্যে আমাদের বাধা দিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া এক জনের কথা মনে পড়ে। তার আঘাত সাংঘাতিক, মৃত্যু আসন্ন। এমন সময় সে তার অবনত মাথা কষ্টে তুলিয়া একটু হাসিল। পরলোকের যে পথিক—তার অধরে সেই অগ্রাহ্যের ও কঠিন সঙ্কল্পের হাসি অতি ভয়ঙ্কর।

ভাবিয়াছিলাম শত্রু এইবার নিরস্ত হইল, কিন্তু আমাদের অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বহু শত্রুসৈন্য প্রত্যুষে আবার আক্রমণ করিল।

---

* এক 'মিটার' এক গজ অপেক্ষা তিন ইঞ্চির কিছু বেশি।

অবিরাম গোলা বর্ষণের আড়ালে পদাতিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখের সারিতে শত্রুসেনার সংখ্যা কেবলই বাড়িতেছে—মনে হইল যেমন করিয়া হউক কেন্‌জান্ দখল করিবার পণ তারা করিয়াছে! বারবার শত্রু-আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আমাদের নানা অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, ইহা একটা মস্ত সুবিধা। তবুও এবার বিশেষ বেগ পাইতে হইল। শত্রু অনেক, তবে আমাদেরও সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়াছে—আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থারও উন্নতি হইয়াছে। ফলে, এই যুদ্ধ আমাদের কেন্‌জান্-আক্রমণের তুল্যই ভীষণ হইয়া উঠিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শত্রুর কামানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। একাধিক গিরিশিখর হইতে কেন্‌জান্ ও আমাদের পদাতিক শিবিরের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গোলন্দাজের অপূর্ব্ব তৎপরতা, লক্ষ্যও প্রায় অভ্রান্ত। এক মিনিট ত দূরের কথা, এক সেকেণ্ডেরও বিরাম নাই—গোলাগুলি অবিরাম পড়িতেছে। প্রত্যূষ হইতেই আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিকেরাও কামান ও বন্দুক চালনা করিয়া শত্রুকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

ক্রমে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল—পাখীর আর উড়িবার ঠাঁই নাই, জীবজন্তুর লুকাইবার স্থান নাই। শূন্য যেন গুরুভার—দিগ্বিদিকে অবিচ্ছিন্ন গভীর নিনাদ—সারা আকাশ ও ধরণী যেন অগণ্য উন্মত্ত অসুরের ক্রোধকবলিত। শত্রুর বিস্ফোরক গোলা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া মাথার উপর ফাটিতেছে—নির্দ্দয়ভাবে আঘাত হানিতেছে, হত্যা করিতেছে! তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের গোলন্দাজেরা প্রাণপণে যুঝিতেছে—কখনো বা দায়ে পড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে শত্রুর দল বৃদ্ধি হইতেছে—অমনি নূতন বিক্রমে তারা আক্রমণ সুরু

করিতেছে। আমরাও 'রিজার্ভ' দলের কতক অংশ যুদ্ধে নামাইয়াছি—কয়েকদল গোলন্দাজও বড় বড় কামান লইয়া আশপাশে আড্ডা গাড়িয়াছে। দক্ষিণে শাকুহো নামক স্থানে নৌ-গোলন্দাজেরা স্থাপিত। এইরূপে উভয় পক্ষের শক্তি বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকেই অপরের উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিল। দিন শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আসিল, সংগ্রামের তবুও বিরাম নাই।

নিরানন্দ যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চাতে ঘনপাণ্ডুরতা—সমস্তই কেমন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আজিকার যুদ্ধ কি নিষ্ফল হইল? মন বলিতেছে, নিশাগমে শত্রু নিরস্ত হইবে না—আমাদিগকে শ্রান্ত অবসন্ন করিয়া আমাদের গোলাগুলির অভাব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই তারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোলা চালাইয়াছে! তাই রাত্রে সজাগ সতর্ক হইয়া তাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গভীর রাতে প্রচণ্ড আক্রোশে শত্রু একযোগে আক্রমণ করিল। মনে হইল, তাদের 'উলা'-ধ্বনি যেন শত শত বন্যজন্তুর গর্জ্জন! অন্ধকারে তাদের কিরিচ জ্বলিতেছে তুষারের উপর সূর্য্যরশ্মির মত। ভাবিলাম, এবার শত্রুকে দেখাইব, আমরা কেমন পদার্থ! সকলে লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলাম—সে অব্যর্থ সন্ধানের মুখে শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত। 'উলা'-ধ্বনি ক্রমেই নিস্তেজ হইতে লাগিল—অসির জৌলুসও অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আবার চারিদিক নীরব। সেই নীরবতায় তৃণভূমি হইতে পতঙ্গের করুণ গুঞ্জন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত আহত রুশেদের কাতরানি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। উপরে, আকাশে ঘনমেঘ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—বর্ষণ আসন্ন, সন্দেহ নাই। সে-বর্ষণের পূর্ব্বে আমাদের নয়ন দু-ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিল—এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিল, তাদের জন্য!

১১

# প্রতিরোধ

প্রতিরোধের কাজ বিষম বিড়ম্বনা! ভিতরে বাহিরে হয়ত যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তবু সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। কাজের অভাবে কটিবন্ধ হইতে বিলম্বিত অসি গুমরাইতেছে, হাতের পেশিগুলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছে, তথাপি নিরুপায়! আক্রমণের গোড়ার কথা প্রতিরোধ—এ কথা কিন্তু ভুলিলে চলে না। যুদ্ধপ্রণালী স্থির করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সতর্ক প্রতিরোধের সব রকম উপায় অবলম্বন করিতে হয়, শত্রুর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাদের সৈন্যসংস্থান আবিষ্কার করিতে হয়। কাজেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যেন সরোবরের মধ্যে "ড্রাগন"-এর ক্ষণস্থায়ী আত্মগোপন, আর আমাদের যুদ্ধযাত্রা যেন মেঘ ও কুয়াসায় ঢাকা "ড্রাগন"এর স্বর্গারোহণ!

শত্রু কেন্‌জান্ লইতে না পারিয়া স্কুয়াংতাইকু ও আস্তুজুলিং এবং দক্ষিণে তাইপোযান্ ও লাওৎসোযানের দিকে অনেকটা পিছু হটিয়া গেল। সেখানে বরাবর পাহাড়ের উপর সুদৃঢ় বাধা তুলিয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইল। আমরা যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই রহিলাম, শত্রুকে কণা পরিমাণ ভূমিও ফিরাইয়া দিলাম না। হুয়াংনি-চুয়ান্-তাষাংতুনের উত্তর পূর্ব্বের পাহাড়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা আমাদের দলের কাজ। প্রথম দিনই কোদাল ও শাবল লইয়া মাটি খুঁড়িতে সুরু করিলাম। চুংচিয়াতুনের তুলনায় এবার

আমরা শত্রুর আরও নিকটে আছি। শত্রু মাঝে মাঝে হানা দিবে ইহা নিশ্চিত, তাই প্রতিরোধের রীতিমত ব্যবস্থার প্রয়োজন। অবিরাম কঠিন যুদ্ধের পরও সৈনিকের বিশ্রামের অবসর নাই, সে-চিন্তা তাদের মনেও ওঠে না। দিনরাত তারা বালির বস্তা ও তারের বেড়া পিঠে লইয়া খাড়া পাথুরে পথ দিয়া ঘাসের চাবড়া বা ছুঁচলো পাথর ধরিয়া ধরিয়া উঠিতেছে।

কঙ্কালের মত এক পাষাণময় তুঙ্গশৈলের উপর আমাদের আস্তানা, পাহাড়ের ধার নীচে উপত্যকায় প্রায় সোজা নামিয়াছে। জলশূন্য বৃক্ষবিরল পাহাড়। একমাত্র সুখ—কুয়াসার ভিতর দিয়া দূরে লাও-তীযানের দুর্গশ্রেণী চোখে পড়ে, নিকটের পাহাড়েও গড়-ঘেরা মাটির ঢিপি দেখিতে পাই। দেখিয়া কল্পনা করি, অচিরে ওই রঙ্গমঞ্চে আবার যবনিকা উঠিবে—আবার ওখানে এক জীবন্ত নাট্যাভিনয় দেখিতে পাইব। দুর্ব্বার সংগ্রামের আমেজ পাইতেছি—এবার যেন এমন করিয়া নিঃশেষে আত্মাহুতি দিতে পারি, যাহাতে দেহের কণা পরিমাণ অস্থি-মাংসও অবশিষ্ট না থাকে !

কঠিন পরিশ্রম আর ব্যর্থ কল্পনায় দিন কাটিয়া যায়। রাত্রির নিকষ কালো পর্দ্দা ঠেলিয়া একদল কালো মূর্ত্তি পাহাড়ে উঠিয়া আসে। উহারা কে ? সারাদিনের শ্রমে কাতর সৈনিককে অব্যাহতি দিবার জন্য নূতন লোক আসিতেছে। তবে কি রাতেও কাজ চলে ? চলে বই কি—আক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এই রাতের কাজই আসল। দিনের বেলা, কোথায় কাজ চলিতেছে নির্ণয়ের জন্য শত্রু গোলা চালায়—তখন একটানা কাজ অসম্ভব। তাই রাতে খাটিয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে হয়। দূরে শত্রু-শিবির হইতে উত্থিত ধোঁয়ার পানে চাহিয়া আমাদের সৈনিকেরা পাথরের গাদা দেয়, বালি বহিয়া

আনিয়া থলি ভর্ত্তি করে এবং তারের বেড়া দিবার খোঁটা পোঁতে। যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাজ করিতে হয়—ধূমপানের উপায় নাই, বলাই বাহুল্য। একটি সিগারেট ধরাইলে শত্রু গুলি চালাইতে পারে!

রাত দুটা তিনটা পর্য্যন্ত দারুণ ঝড়জলের মধ্যেও কাজ চলিতে থাকে। প্রত্যূষে কেবল ক্ষণকালের বিশ্রাম। কেহ কেহ তখনো বন্দুক-কাঁধে মূর্ত্তির মত খাড়া দাঁড়াইয়া শত্রু-শিবির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। শান্ত্রীদের কাজ মোটেই সহজ নয়। অনাবৃত আকাশতলে শীতল নিশীথ বাতাসে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া তারা বলাবলি করে—বেজায় শীত হে! আজ আবার ওঁরা (শত্রু) আসছেন না কি?

রুশ গোলন্দাজেরা ঠিক কোথায় কেহ জানে না। উপত্যকায় আমাদের কর্ম্মচারীদের শিবির—সেখানে তারা গোলা ফেলিত। এক-দিন একটা প্রকাণ্ড গোলা উড়িয়া আসিয়া দারুণ শব্দে ফাটিয়া গেল। পাহাড়ের খানিকটা চূর্ণ হইল, পাথর ছিটকাইল, পীতাভ ঘন ধোঁয়ায় চারিদিক ভরিয়া গেল, মাটি কাঁপিয়া উঠিল। যুদ্ধে ব্যবহৃত সাধারণ কামানের গোলার অভিজ্ঞতা ছিল—এতবড় গোলা এই প্রথম দেখিলাম। ভারি বিস্ময় বোধ হইল—তবে কি শত্রু লুংওয়াংতাঙে নৌ-কামান টানিয়া তুলিয়া গোলা দাগিতেছে?

আর একটা ব্যাপারেও মনে খটকা লাগিল। প্রত্যহ প্রায় একই সময়ে শত্রু আমাদের পানে স্ববিক্রমে গোলা চালাইত, সর্ব্বদাই সেনাধ্যক্ষের আড্ডা লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িত—তার ফলে আমাদের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হইতে লাগিল। মনে হইত, শত্রুর এই আচরণের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে, কিন্তু তা ভেদ করা মোটেই সহজ নয়। অবশেষে দীর্ঘকাল সতর্ক সন্ধানের ফলে জানা গেল যে, আমাদের শান্ত্রীশ্রেণীর পিছনে চীনারা গরু বা ভেড়ার পাল লইয়া

পাহাড়ে উঠিত—জন্তুগুলি চরানোই যেন তাদের উদ্দেশ্য! তথা হইতে দূরবর্ত্তী রুশ-দলকে সঙ্কেত করিত। যেদিকে বা যে গ্রামে গোলা ফেলা দরকার, একটা কালো গরু বা একপাল ভেড়া ধীরে ধীরে সেদিকে চালিত করিয়া ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিত!

মাসের শেষের দিকে আমাদের সন্ধানী কর্ম্মচারীরা শত্রুর প্রহরী-শ্রেণী ভেদ করিয়া তাদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে অতর্কিতে ঘেরিয়া ফেলিল। কাজ হাসিল করিয়া ফিরিবার পথে তিন চার জন রুশ সন্ধানী দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এদিক ওদিক তাড়া খাইয়া বন্দী হইবার ভয়ে তারা মরিয়া হইয়া গুলি চালাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত কেবল একজনকে বন্দী করিয়া জাপানী কর্ম্মচারীরা সগৌরবে ফিরিয়া আসিল।

বন্দীকে যথাবিধি প্রশ্ন করা সুরু হইল। সে একজন পদাতিক কর্ম্মচারী। ঘনঘন মাথা নোয়াইয়া সে প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। যাহা জানে সমস্তই প্রকাশ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। যেখান থেকে শত্রুর গতিবিধি নজরে পড়ে সেখানে লইয়া গেলে সে রুশ-সৈন্যের সংস্থান-ব্যবস্থা অসঙ্কোচে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল। তার উত্তরের সঙ্গে আমাদের লোকের সংগৃহীত বিবরণ মিলাইয়া দেখা গেল, সে মিথ্যা কহে নাই। সে যাহা জানিত সমস্তই অকপটে প্রকাশ করিল—আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইলাম। তবুও তার প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে ঘৃণারই উদ্রেক হইল—সে কাপুরুষ বলিয়া!

আর একজন রুশ সৈনিকের পরীক্ষার কথা বলি। আমাদের কেন্‌জান্ আক্রমণের পরের রাত্রে একটা প্রকাণ্ড পাথরের তলায় সে ধরা পড়ে। সেখানেই সে লুকাইয়া ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা হইল কতকটা এইরূপ—

"আমাদের আক্রমণ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি ?"

"আমরা ভয় পাইয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবিতেছিলাম জাপানীদের ভীষণ আক্রমণ সুরু হইবে।"

"নায়কেরা তোমাদের যত্ন আত্তি করে ত ?"

"প্রথম যখন পোর্ট-আর্থারে আসি, তখন বেশ সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, কিন্তু ইদানী আর তেমন নাই। মাস-তিনেক হইতে বেতনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইতেছি। রসদের পরিমাণও সম্প্রতি প্রায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে—বাকি যায় ওদের পকেটে !"

"নান্‌শানে পরাজিত রুশেরা কি পোর্ট-আর্থারে ফিরিয়াছে ?"

"আসল দুর্গের মধ্যে তারা প্রবেশ করিতে পায় নাই—প্রথম 'লাইনে' কাজ করিবার আদেশ পাইয়াছিল। খাদ্য অবশ্য পায় নাই, কারণ তার না-কি অভাব ! অগত্যা সেটা সংগ্রহের ভার তাদেরই !"

"তোমার দেশের লোক অনেকে বন্দী হইয়া জাপানে গেছে খবর রাখ কি ?"

"হাঁ জানি। এই সেদিন আমারই এক বন্ধু সেখানে গেল !"

## ১২

## শিবির-জীবন

ভাবিতাম, তাঁবুগুলো অন্তত বৃষ্টি ও হিম আটকাইবার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টির উপদ্রবে অধুনা তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ষাট দিন হইল জাহাজ হইতে নামিয়াছি, ষাট দিনই তাঁবুর মধ্যে বাস। তাঁবুই আমাদের সাধারণ বাসস্থান—সেই একখান

ক্যাম্বিসই আমাদের সম্বল। রোদ আটকানো ছাড়া, আপাততঃ আর কোনো কাজে উহা লাগে না। দেহ নয় প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিল, কিন্তু রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি রক্ষা পায় কিরূপে? অথচ এ সব পদার্থ আমাদের জীবনের মতই মূল্যবান! নিরুপায় অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যেও সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না—সুখস্বপ্ন আমাদের দিনের শ্রান্তি দূর করে। তখন আমাদের সুপ্ত মুখের পানে চাহিলে দেখিতে পাইবে, সাজ-পোষাক আঁটিয়া আমরা ঘুমাইয়া আছি। মাথার লম্বা চুল এলোমেলো বিপর্য্যস্ত, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, রোদে-পোড়া গায়ের চামড়ায় ধূলামাটির প্রলেপ—যেন ভিখারী বা ডাকাতের পাল!

সকলেই কৃশকায় হইয়া পড়িয়াছে। আহারেই আমাদের একমাত্র আনন্দ। একটু অবসর পাইলেই মনে হয়—কি খাওয়া যায়?

"ভাল খাবার কিছু আছে?"

"না, তোমার কাছে নিশ্চয়ই আছে। দাও না ভাই একটু।"

দুজনে দেখা হইলেই এমনিধারা আলাপ হয়। মুখ বদলাইবার ইচ্ছা অদম্য হইলে ছোলা মটর বা গম ভাজিয়া ইঁদুরের মত কুড়মুড় শব্দে চিবাইতে থাকি!

ডাল্‌নি দখলে আসার পর জিনিষপত্র আনার সুবিধা বাড়িল। ঠিক যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার সময় ছাড়া আর বিশেষ কষ্ট রহিল না। সৈনিকেরা নিয়মিত রসদ পাইতে লাগিল—নিজেরা রাঁধিয়া খায়। পাহাড়ের ছায়ায় বা পাথরের টিপির আড়ালে শুকনো ভুট্টাগাছ জ্বালাইয়া রান্না হইতেছে, নিবস্ত আগুনের ধোঁয়ায় অধীরভাবে ভাত সিদ্ধ হইবার আশায় তারা বসিয়া আছে, দেখিতে পাইতাম। তাদের দেখিয়া মনে হইত যেন একপাল ফুর্ত্তিবাজ ছেলে! শশা, শুকনো মূলা, শাক-সবজি, শুকনো রাঙা আলু বা টিনেভরা খাদ্যেই তাদের সম্যধিক

রুচি। বিনা জলে শুকনো বিস্কুট গেল। সাধারণত যাদের অভ্যাস, আধসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে দু-একটা নুনে-জরানো কুল পাইলে যারা রীতিমত ভোজ বলিয়া মনে করে, উপরোক্ত আহার্য্য পাইয়া তারা যে বর্ত্তিয়া যাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমানে চুংচিয়াতুন অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ স্থানে আছি। এখানে কিছু কিছু শ্যামল তৃণ আছে, দু-চারিটি ফুলও হাসিতেছে। ঝিনুকের খোলের মধ্যে ফুলগুলি সাজাইয়া রাখি, কখনো বা কোটের বোতামে আটকাইয়া তাদের সৌরভ আঘ্রাণ করি। ক্ষুদে ক্ষুদে নীল "Forget-me-not"-এর পানে চাহিয়া কল্পনায় ভর করিয়া প্রিয়জনের কাছে উড়িয়া যাই!

রুশ ছাড়া জাপানী যোদ্ধার অপর এক শত্রু ছিল—আব্‌হাওয়া নামক বিষম দানব। মানুষ যতই কেন সাহসী হোক, হঠাৎ পীড়িত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগে বাধ্য হইতে পারে। ইহাকেই বলে 'আবহাওয়া' নামক শত্রুর হাতে ঘায়েল হওয়া। কখনো কখনো আর এক শত্রুর হাতে তারা ঘায়েল হয়—তার নাম 'খাদ্য'। মুক্ত আকাশতলে বৃষ্টি বাতাসের মাঝে থাকার দরুণ কখনো কখনো সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়। কাছাকাছি গাছ-জাতীয় কিছু ছিল না বটে, তবে ঘাস ছিল যথেষ্ট। তার দ্বারা কাজ-চালানো-গোছ ঘরের ছাউনি হইতেও পারে। সেই ঘাসের চালা রৌদ্র নিবারণে যথেষ্ট হইলেও ঝড়বৃষ্টিতে একেবারে অচল, বর্ষাকালে আমাদের ছেঁড়া তাঁবুর চেয়েও অধম। শত্রুর গোলার ঝড় তবুও সহ্য হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড় একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। দিনরাত অতি পরিশ্রম, নিদ্রাভাব, অতি কদর্য্য জলপান, তার উপর বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া হাড়-ইস্তক ঠাণ্ডা হইয়া যায়! এ সবের ফলে সৈন্যশ্রেণীতে আমাশয় দেখা দিয়া অনেককেই অকেজো করিয়া ছাড়িল। আমি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট

ছিলাম—উক্ত রোগের কবলে পড়িয়া অতি দ্রুত দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্য হারাইতে বসিলাম। ভয় হইল শেষ পর্য্যন্ত বা সেই শত্রুর হাতেই পরাজয় ঘটে! ভাবনায় বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম।

প্রতিদিনই যুদ্ধযাত্রার আদেশ পাইব আশা করিতেছিলাম। সুস্থ হওয়ার পূর্ব্বে আদেশ আসিলে আমরা পড়িয়া থাকিব—আর যুদ্ধের গৌরবের ভাগ পাইব না! একে অসুস্থতা, তার উপর ভাবনাচিন্তায় অধীরতা ও দুঃখের ভারও বাড়িয়া গেল। তখন যে তিন ব্যক্তি আমার উপকার করিয়াছিলেন তাঁদের সহৃদয়তা কখনো ভোলা সম্ভব নয়—দু-জন অস্ত্রচিকিৎসক, মাসাইচি-য়্যাসুই ও হাজিমে-আন্দো; আর আমার সৈনিক-ভৃত্য বুন্‌কিচি-তাকাও।

আমার রোগ ছোঁয়াচে, তবুও তাঁরা নিয়ত আমার কাছে কাছে থাকিয়া সযত্নে ঔষধ পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিতেন। আনন্দ ও সান্ত্বনা দিবার জন্য কত মজার মজার গল্প বলিতেন। তাঁদেরই চেষ্টায় সুস্থ হইয়া আবার যুদ্ধে যোগ দিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল। এইরূপে তাঁদের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া, যতদিন সেখানে ছিলাম, তাঁদের দুঃখের ও শ্রমের ভাগ লইয়া তৃপ্ত হইতাম।

সুদৃঢ় দুর্গের ভীষণ অবরোধ যখন চলে, তখন যারা সম্মুখে থাকে, আঘাত ও মৃত্যু কেবল তাদেরই মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না—পশ্চাতে অস্ত্র-চিকিৎসক ও অন্যান্য অ-যোদ্ধার মধ্যেও উহা আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে আহতকে তুলিয়া আনার জন্য, নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া গোলাগুলির মুখেও ডাক্তারকে আগুসার হইতে হয়। এমন অবস্থায় কে যে আগে মরিবে কেহ তাহা জানে না।

যুদ্ধক্ষেত্রের গোলমালে কার বিশেষ বন্ধু কোথায় মরিল সাধারণত জানা অসম্ভব, তার দেহও খুঁজিয়া পাওয়া দায়। মৃত বা জীবিত অবস্থায়

তার সাক্ষাৎ লাভ এত অনিশ্চিত যে, তেমন দুরাশা কেহই করে না। তাই পোর্ট-আর্থার দুর্গের প্রথম আক্রমণ ঘোষিত হইলে ডাক্তার-দুজনের হাত ধরিয়া শেষ বিদায় লইলাম। আবার তাদের দেখিবার আশা ছিল না।

সৈন্যাবাসে যে সৈন্যদল আমার শিক্ষাধীন ছিল, তার মধ্যে আমার সৈনিক ভৃত্য বুন্‌কিচি-তাকাও অন্যতম। তার অনুরাগ, আগ্রহ ও অকপট ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সদরে বদলি হইবার পর অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তার নায়কের অনুমতি আদায় করিয়া তাহাকে ভৃত্যের কাজে বাহাল করি। শান্তির সময়, কর্ম্মচারী ও তার ভৃত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই থাকে, কিন্তু একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সময় সে-সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়, তখন আর প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, বড় ও ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধ। সকল বিষয়েই আমি তাকাও'র উপর নির্ভর করিতাম—সে'ও আমার অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। রাঁধাবাড়া করিয়া সে আহার পরিবেশন করিত—কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড জলাধার সংগ্রহ করিয়াছিল—দূর থেকে জল আনিয়া তাহা ভরিয়া দিত—তার কল্যাণে গরম জলে স্নানের আরাম উপভোগ করিতাম।

রোগের সময় শ্রান্তি ভুলিয়া সে সারারাত আমার পাশে বসিয়া থাকিত, গা-হাত-পা টিপিয়া আমাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিত। ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাইতে চাহিলে সে আমাকে ভর্ৎসনা করিত—শিশুকে ভুলাইবার মতই বলিত, এখন আপনার অসুখ, এখন কি খেতে আছে? শীগ্‌গির সেরে উঠুন, তখন যা চাইবেন তাই খেতে দেব।

প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে সেবা করিত, এতটুকু নড়চড় হইত না, না চাহিতেই সব কিছু পাইতাম!

আমার সেই সহৃদয় ভৃত্যের কথা কখনো ভুলিব না।

১৩

## স্মৃতি-তর্পণ

পোর্ট-আর্থারে রুশের অধিকার ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, সেই জন্যই আমাদের সৈন্যশ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া হাঁত-পা মেলিবার তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের সামনে এক খাড়া পাহাড়, তার নাম দিয়াছিলাম ইওয়ায়্যামা। সেখানে শত্রুর চর প্রায়ই আমাদের সন্ধান লইতে আসিত। অগত্যা সেই জায়গায় আমাদের এক ঘাঁটি বসানো স্থির হইল।

১৬ জুলাই তারিখে, তখনো গভীর অন্ধকার, লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুগিমুরা কয়েকজন সৈনিক লইয়া সেখানে যাইবার আদেশ পাইল। গ্রীষ্মকালেও রাতের হাওয়া ঠাণ্ডা—সেই ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের মুখে ঝাপটা দিয়া তৃণগুল্মের মাঝে সর্‌সর্ ধ্বনি তুলিল। রাতের পর রাত সুনিদ্রার অভাবে তাদের অবস্থা শোচনীয়—স্নায়ু দুর্ব্বল, দেহে মাংস নাই, সকলেই অস্থিসার। অন্ধকার ভেদ করিয়া তারা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, শত্রুর পদশব্দের জন্য মাঝে মাঝে মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, কারণ এমন রাতে শত্রু নিশ্চয়ই আসিবে। সহসা শান্ত্রী হাঁকিল—শত্রু! অমনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট হুকুম দিল—ছড়িয়ে পড়ো ছড়িয়ে পড়ো! অবিচলিত সাহসে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া জায়গাটি রক্ষা করিবার জন্য সুগিমুরা বদ্ধপরিকর হইল। শত্রু তিনদিক ঘিরিয়াছে, সংখ্যায় তারা অনেক বেশি, যদিও ঠিক তত অন্ধকারে বুঝিবার জো নাই। উপরন্তু তারা 'মেশিন-গান্' সঙ্গে আনিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ভীষণ

মারণাস্ত্র রুশেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। নানশানে ইহারই মুখে শত সহস্র জাপানী চূর্ণ হইয়াছে। মাত্র জন কয় সৈনিক লইয়া তিন দিকে শত্রু-পরিবৃত হইয়া সুগিমুরা লড়িতে লাগিল। তার নিজের এবং দল-বলের শৌর্য্যবীর্য্য এমন যে দুই ঘণ্টা লড়াইয়ের পরও শত্রু এতটুকু ভূমি অধিকার করিতে পারিল না। ফলে হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। কিন্তু সাহসী সুগিমুরা মারাত্মকভাবে আহত হইল— 'মেশিন-গানের' গুলি তাঁর মাথা ভেদ করিয়াছে। যে কয় মিনিট সে বাঁচিয়া ছিল চীৎকার করিয়া সকলকে উৎসাহ দিয়াছে, হু হু করিয়া চোখের মধ্যে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে, তবু নিরস্ত হয় নাই।

রুশপক্ষ দশজনের বেশি মৃত সৈনিক ফেলিয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে 'রেড-ক্রশ' নিশান ও 'ষ্ট্রেচার' লইয়া রুশেরা আসিল। জাপানী শাস্ত্রীদের দিকে গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া মৃত দেহ কুড়াইবার ছলে আমাদের শিবিরে উঁকি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ ত গেল, এ ছাড়া তারা অন্যায়ভাবে শ্বেত পতাকা ও জাপানী সূর্য্য-পতাকার সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের ঠকাইবার ঘৃণ্য চেষ্টা করিয়াছে। একবার নয়, দুইবার নয়, এ চালাকি প্রায়ই তারা করিয়া থাকে। একবার আর এক রকমে তাদের নীচতা প্রকাশ পায়।

একদিন রাতে আমাদের শাস্ত্রী দেখিতে পাইল একটা অন্ধকার ছায়া তার পানে আগাইয়া আসিতেছে। দস্তুরমত সে হাঁকিল, "কে যায়? দাঁড়াও!"

ছায়ামূর্ত্তি উত্তর দিল, "জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী..." শাস্ত্রী ভাবিল হয়ত কোনো কর্ম্মচারী শত্রুর খোঁজে গিয়াছিল, এখন ফিরিয়া আসিল। তাই সে বলিল, "যাও!" হঠাৎ সেই মূর্ত্তি কিরিচ লইয়া তাহাকে অক্রমণ করিল। নিমিষে শাস্ত্রীর ভুল ভাঙিয়া গেল, সে কহিল, "ওরে পাজি,

তুই শত্রু! তবে এই গ্যাখ!" বলিয়া বন্দুকের বাঁট দিয়া এক-ঘায়ে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল।

শত্রু কয়েকটা জাপানী কথা শিখিয়া তাহারই সাহায্যে আমাদের ঠকাইবার চেষ্টা করিত।

বাহকেরা স্থগিমুরাকে তুলিয়া এক গোলাঘরে লইয়া গেল। সেখানে তার সৈনিক ভৃত্য ইতো মায়ের মত যত্নে তার সেবায় নিরত হইল। বিশ্বাসী ইতোর চোখে জল, ভাবনা ও শ্রান্তিভারে মুখ মলিন, তবুও সে আহত প্রভুকে কত মত সান্ত্বনা দিতে লাগিল। স্থগিমুরাকে হাসপাতালে পাঠানোর পরও সে সময় পাইলেই অনেকখানি দুর্গম পথ পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে দেখিতে যাইত। একদিন সদর থেকে ফিরিবার পথে দেখি কাঁধে ভারি বোঝার ভারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক সৈনিক পাহাড়ে উঠিয়া আসিতেছে। কাছে পৌঁছিয়া দেখি সে ইতো। জিজ্ঞাসা করিলাম, স্থগিমুরার অবস্থা কেমন?

"ভারি খারাপ। আজ আর তিনি কোনো কথা বুঝতে পারছেন না।"

"তাই ত! তোমার সেবা যত্নে নিশ্চয়ই তিনি তুষ্ট হয়েছেন!"

কথাটা শুনিয়া ইতো কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "তাঁর সঙ্গে আমিও কেন আহত হইনি, এই আমার দুঃখ! কত দয়া তিনি করেছেন, তার কোনো প্রতিদান দিতে পারিনি, আর এখন তিনি ছেড়ে চল্লেন জন্মের মত! দুজনে একসঙ্গে মরতে পারলে কত আনন্দ হ'ত! এই ত কাল রাতে তিনি আমার হাতখানা চেপে ধ'রে বল্লেন, তোমার স্নেহ ভুলতে পারবো না! শুনে আমার কেবলই মনে হতে লাগলো, কেন তাঁর সঙ্গে আমারও মরণ হ'ল না।"

তার পর সে বলিল, "তবে আসি, আর দাঁড়াবার সময় নেই। দেরি হলে হয়ত তাঁকে দেখতে পাব না।"

হইতে চলিতে লাগিল। তার কাঁধের উপর যে ভারি বোঝা, তাহাতে সুগিমুরারই জিনিষপত্র ছিল।

আর একজনের কথা বলি। সৈনিকটির নাম হেইগো য়্যামাশিতা। লোকটি ভারি বাধ্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রম যতই হোক তার আপত্তি নাই। সঙ্গীরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত, তাদের ধারণায় সে ছিল সৈনিকদের আদর্শস্থানীয়। একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার প্রিয়তম বন্ধুর পানে ফিরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার আশা আমার নেই। দশবছর আগে যে-সব সঙ্গীরা মারা গেছে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বলবো তাদের মৃত্যুর পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে—এ ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই। কিন্তু আমার এক দাদা আছেন তিনি ভারি গরিব। আমি মরলে, তাঁকে জানিয়ো আমার মরণের ফুল কেমন ক'রে কি অপরূপ রূপে ফুটেছিল!"

অনতিকাল পরে এক জরুরি চিঠি বিলি করিবার আদেশ সে পাইল। কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে তার পেটে গুলি লাগিল। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নাই। বলিল, "এ আর এমন কি? বিশেষ কিছুই নয়!"

লোকজন আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল, কারণ তার দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িলেন। দলের নায়ক কর্নেল তাহাকে দেখিতে আসিলেন, সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই। নিরাশ হয়ো না! নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারালে চলবে না!"

মৃত্যু আসন্ন হইল। ঝাপসা চোখে কর্নেল বলিলেন, "এ আঘাত সম্মানের! তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেছ..."

হেইগোর চোখ একটুখানি খুলিল, মুখে যন্ত্রণা-কাতর মিনতি—কর্নেল ক্ষমা...আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ...

তার হাত কাঁপিতে লাগিল, ঠোঁট নড়িয়া উঠিল, যেন সে আরও কিছু বলিতে চায়, কিন্তু তা আর হইল না। দেখিতে দেখিতে সে পরপারে যাত্রা করিল, যেখান থেকে কাহারও ফিরিবার উপায় নাই।

কেন্‌জান আক্রমণ থেকে এ পর্য্যন্ত বড় কম লোক মরে নাই। সেই সব বীরাত্মাকে স্মরণ করিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মেঘলা সন্ধ্যার দিকে লিংশুইহোৎজুর কাছে এক গোলাবাড়িতে একটি বেদী স্থাপনা করা হইল। নামেই বেদী, কিন্তু আসলে এক কৃষকের উঠান থেকে আহরিত একটি ডেস্ক। সাদা কাপড়ে সেটি ঢাকিয়া তার উপরে টাঙানো হইল 'অমিদা' বুদ্ধের এক ছবি। ধর্ম্মযাজক তোয়ামার কাছে ছবিখানি পাওয়া গেল। বেদীর সামনে মৃতের ভস্মাবশেষ-ভরা বাক্সগুলি থাক দিয়া সাজানো হইল—চারি কোণা বাক্স, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি। ধূপ জ্বালানো হইল, বেদীর মুখ রহিল পোর্ট-আর্থারের দিকে। মোমবাতির ম্লান আলোয় নিরানন্দ শোকের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, নিকটে ও দূরে পতঙ্গদল সুর করিয়া যেন জীবনের নশ্বরতার কথা প্রচার করিতে লাগিল। বাতাস সিরসির করিয়া উইলোর শাখা চিরুণীর মত আঁচড়াইতে লাগিল, আর তারই মাঝ দিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল যেন আকাশের কান্না। বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইল নায়কেরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, তাদের পিছনে দাঁড়াইল সেনাদল। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ শেষে প্রধান নায়ক অগ্রসর হইয়া ধূপ জ্বালাইলেন, তারপর মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য নায়কেরাও একে একে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। স্তব্ধ নির্ব্বাক সভা, কেহ কোনো কথা বলিল না। অগোচরে নায়ক ও সৈনিকের জামার আস্তিন ভিজিয়া উঠিল—সে কি কেবল বৃষ্টির জলে?

১৪

## তাইপোয়ানের যুদ্ধ

আমরা যেখানে আছি প্রতিদিন সেখানকার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। এবার আগে চলার আয়োজন সুরু হইল। নান্‌শানে শত্রুর বারোটি কামান দখলে আসে, লুয়ান্নিচিয়াওর কাছে উচ্চভূমিতে সেগুলি বসানো হইল; তা ছাড়া চুচুয়ানৎজুর পশ্চিমে উচ্চভূমিতে রাখা হইল ছয়টি অতিকায় নৌ-কামান। শত্রুর অগ্রবর্ত্তী ঘাটির খবর আনিবার জন্য সন্ধানী দল ঘনঘন যাইতে লাগিল। ধনুকের জ্যা একমাস ধরিয়া টানিয়া আছি, এইবার তীর ছাড়িবার জন্য আমরা প্রস্তুত—কেবল প্রস্তুত নয়, উৎসুক। সৈনিকদের উৎসাহে বান ডাকিয়াছে—আক্রমণের এই সুযোগ। আটাশে জুলাই আমাদের বিভিন্ন দল যাত্রা করিল দক্ষিণে রুশের আড্ডার উপর নামিবার জন্য।

আমার দলের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত তাইপোয়ান দখল করা। যুদ্ধের পূর্ব্ব রাতে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল লড়াইয়ের প্রণালী পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন। নায়ক ও সৈনিককে প্রাণপণে লড়িতে বলিলেন, জায়গাটি দখল করা চাই-ই, কারণ এই যুদ্ধে জিতিলে তবেই পোর্ট-আর্থারের আসল অবরোধ সুরু হইতে পারে। আমাদের কর্নেলও বলিলেন, এই প্রথম আমাদের সমগ্র রেজিমেণ্ট যুদ্ধে যোগ দিবে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আসলে যুদ্ধের সুরুতেই সূচিত হয়। তিনি আমাদের নায়ক, আমাদের প্রাণের মালিক এখন তিনিই, তাহা বলি দিতে তিনি দ্বিধা করিবেন না—লড়াইয়ের সময় যে-কোনো উপায় সমীচীন বোধ হইবে তাহাই

তিনি অবলম্বন করিবেন। তিনি আরও বলিলেন, 'বুশিদো' বা জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্মের শক্তি পরীক্ষার এই সময়। মহামহিম সম্রাট্ কৃপা করিয়া আমাদের উপর যে-বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে হইবে আমরা তার অনুপযুক্ত নই, প্রয়োজন হইলে পতাকাতলে সকলেরই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে!

যাত্রার আগের রাতে শিবিরের দৃশ্য অ-সাধারণ। হেথা-হোথা সৈনিকেরা ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছে, কেহ বা একা দাঁড়াইয়া আলগাভাবে বন্দুক ধরিয়া আপন মনে ঈষৎ হাসিতেছে—কেন, তা সে-ই জানে। অনেকে অন্তর্বাস ( underwear ) বদলাইয়া তাদের সবসেরা ধোপদস্ত পরিষ্কার অন্তর্বাস পরিতেছে—ময়লা কাপড়ে মরিয়া তারা শত্রুর অবজ্ঞাভাজন হইতে চায় না! আবার কেহ কেহ উদাসভাবে আকাশ-পানে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতেছে।

পরদিন শেষরাত্রে চারিদিকে নিবিড় কুয়াসা—একফুট সামনেও দৃষ্টি চলে না; পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টির পর থেকে হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। এমন সময় হাজার হাজার সৈনিক অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে সুরু করিল সুদীর্ঘ অজগরের মত! রাত তিনটায় ইওয়ায়্যামা পাহাড়ের পাদমূলে পৌঁছিলাম। আমাদের রেজিমেণ্টের 'রিসার্ভ' দল এখানে থাকিবে, পাহাড়ের মাথায় থাকিবে 'স্কার্মিশার্স্', ডানদিকে অপর একটি পাহাড়ে থাকিবে গোলন্দাজ। যুদ্ধ সুরু করিবার সঙ্কেত না পাওয়া পর্য্যন্ত সৈন্যশ্রেণী থেকে কাহারও মাথা বাড়াইবার হুকুম নাই। সকলে বন্দুকে গুলি ভরিয়া কার্ত্তুজের বাক্স খুলিয়া রাখিল, নিশ্বাস রুধিয়া সকলেই কর্নেলের 'ফায়ার' আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। ইওয়ায়্যামার মাথায় দূরবীন্ হাতে কর্নেল দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর সামনে খোলা ম্যাপ হাতে দাঁড়াইয়া অ্যাড্জুট্যাণ্ট; মাঝে মাঝে সে

ম্যাপের কক্ষ হাতড়াইতেছে। গোলাগুলিবাহী ঘোড়াগুলো পাহাড়ের তলায় জড়ো হইয়াছে, মালবাহী সৈনিকেরাও কাজ সুরু করিবার জন্য অধীর। সঙ্কেত হইবে একটি কামানের শব্দ। নিজ নিজ ঘড়ির কাঁটার পানে তাকাইয়া আছি, এক এক মিনিট যায় আর বুক ঢিপঢিপ করিতে থাকে।

অবশেষে এগারোটা উনপঞ্চাশ মিনিটে বাঁ দিকে তোপের আওয়াজ পাওয়া গেল। লাওৎসো-যান্ থেকে তাইপোযান্ পর্য্যন্ত শত্রুকে আক্রমণ করার এই সঙ্কেত। গত ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি গোলাও ছাড়া হয় নাই—ইহার জন্য শত্রু আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি তারা যে উত্তর দিল তা ভারি অলস ও নিস্তেজ শুনাইল—আমাদের মাথার অনেক উপর দিয়া তাহাদের গোলা চলিয়া গেল! স্থির ছিল আমাদের বাঁ দিকের সৈন্যদল প্রথমে লাওৎসো-যানের উপর শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবে, পরে আমাদের দল গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। তাই কিছুক্ষণ স্থির হইয়া সেই আক্রমণের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। একটু পরে আমাদের নৌ-কামানগুলো এমন সোরগোল তুলিল যে মনে হইল শত্রুপক্ষ অচিরে ভয়ে তটস্থ হইয়া ঘাটি ছাড়িয়া পালাইবে, কিন্তু দেখা গেল তারা ততটা দুর্ব্বল নয়।

যুদ্ধের তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের সমস্ত কামান লাওৎসো-যানের উত্তরের ঢালুতে শত্রুর বড় কামানগুলোকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শত্রুর গোলাবর্ষণ একটু কমিয়া আসিল, সুযোগ বুঝিয়া আমাদের বাঁ দিকের পদাতিক দল জাপানী তোপের আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে সুরু করিল। অবিলম্বে তারা আন্দাজ দু'হাজার গজ সামনে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার উচ্চভূমি দখল করিল, তারপরেই বামে ঘুরিয়া বেলা দশটার সময় লাওৎসো-যানের উত্তর মুখের

বাঁধটা দখল করিল। মনে হইল রুশেরা এই সব জায়গা সুরক্ষিত করিবার তেমন বন্দোবস্ত করে নাই, কারণ খানিক বাধা দেওয়ার পর তারা এখানকার বড় কেল্লা ছাড়িয়া দিল। আমাদের পদাতিকেরা পাহাড়ের মাথা দখল করার পরও কতক শত্রু নির্ভয়ে দক্ষিণে ঢালুর উপর দাঁড়াইয়া মরিয়া হইয়া আমাদের নিম্নগামী একাগ্র গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হইল— আক্রমণ এতক্ষণ চলার তাহাই কারণ। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাঁ দিকের দল তাহাদিগকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তাদের পিছনে ছিল লুংওয়াংতাং খাঁড়ি, তাই সেদিকে পলায়ন অসম্ভব। ফলে বহু হতাহতকে ফেলিয়া বাদবাকি নৌকার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া খাঁড়ির ওপারে গিয়া লুকাইল।

বাঁ দিকের দলের (left wing) কর্ত্তব্য এইভাবে সম্পন্ন হইল। এবার আমাদের পালা। কর্নেল আওকি কাপ্তেনদের হুকুম করিলেন, ডানদিকের দল, গুলি চালাতে সুরু করো! অমনি সমস্ত শ্রেণী মাথা বাড়াইয়া দিল, চড়বড় করিয়া তাদের বন্দুকের শব্দ হইল মুড়িভাজার মত। সঙ্গে সঙ্গে, রুশেদের গুলি বড় বড় ফোঁটায় আমাদের চারিদিকে পড়িতে লাগিল—বালি উড়াইয়া, পাথর ছিটকাইয়া, মানুষকে ধরাশায়ী করিয়া। কানের কাছ দিয়া যেগুলো যায় তারা শিস দেওয়ার মত শব্দ করে, শূন্যে উঁচু দিয়া যেগুলো যায় কম্পমান গম্ভীর তাদের শব্দ। দীর্ঘ সৈন্যশ্রেণী শিকলের মত বিলম্বিত, তাদের মাঝে মাঝে জোড় ভঙ্গ হইতে লাগিল। 'ষ্ট্রেচার' লইয়া বাহকেরা হতাহতকে তুলিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শিলা-বৃষ্টির মত কেবল বন্দুকের গুলি নয়, বড় বড় কামানের গোলা আমাদের মাথার উপর ফাটিয়া সাদা ধোঁয়া ছড়াইতে লাগিল। গোলার টুকরা ধুপধাপ করিয়া পড়িয়া মাটিতে গর্ত্ত করিতেছে কিম্বা আক্রমণকারীর

মাথার উঁপরে বিঁধিয়া বসিতেছে। কখনো কখনো গোলার শূন্য খোলটা পাহাড় ডিঙাইয়া আমাদের 'রিসার্ভ' দলের মধ্যে গিয়া পড়ে। আমি যখন 'রিসার্ভে' ছিলাম তখন এমনি একটা শূন্য গোলার খোল এক সৈনিকের গায়ে লাগিতে দেখি—তার ফলে তার ডান হাত উড়িয়া গিয়া সেখানেই সে মারা পড়ে। পরে সেই খোলটা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তার মধ্যে প্রথমে এক টুকরা ওভারকোট, তারপর এক টুকরা কোট, তারপর এক টুকরা গেঞ্জি, তারপর মাংস ও হাড়, তারপর আবার গেঞ্জি কোট ও ওভারকোট, সঙ্গে রক্তমাখা ঘাস ও নুড়ি—সে এক অভিনব ও ভয়ঙ্কর canned goods ( টিনে ভরা মাল ) !

এই যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল। শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হইল না। আমাদের হতাহতের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতে লাগিল যে 'ষ্ট্রেচার' তৈরি করিয়া কুলানো দায়। আমাদের অনেক পিছনে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরেও গোলা পড়িতে লাগিল। সেখানে জনকয় আহত সৈনিক দ্বিতীয় দফা আঘাত পাইল বা মারা পড়িল। এ এক সাংঘাতিক যুদ্ধ। গোলন্দাজদের বামে 'রিসার্ভ' দল আনা হইল, সুযোগ উপস্থিত হইলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা ছুটিয়া গিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে। এ সময়ে আমি 'রিসার্ভ' দলের পতাকাবাহী ছিলাম। গোলন্দাজদের সঙ্গে আছি এবং পতাকাটা বেশ স্পষ্ট, তার ফলে ওয়াংচিয়াতুনের রুশেরা আমাদের উপর ভীষণভাবে গোলা দাগিতে লাগিল। শত্রুর লক্ষ্য ভাল, গোলাগুলো বাতাসে বৃষ্টিধারার মত কাত হইয়া আসিতে লাগিল। মিনিট খানেকের জন্য ধোঁয়া সরিয়া গেলে দেখিলাম; একজন লেফটেন্যাণ্ট—সে সেইমাত্র সাহসের সঙ্গে সৈনিকদের চালনা করিতেছিল—রক্তমাখা দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। গোলন্দাজ-নায়ক ও তার সহকারীরা টুকরা টুকরা

হইয়া গেছে, তাদের মাথার ঘি ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইয়েছে, নাড়-ভুঁড়ি কাদায় ও রক্তে মাখামাখি। 'রিসার্ভ' গোলন্দাজেরা তাদের স্থান লইতে গেল এবং তারাও মারা পড়িল।

অবস্থা এমন দাঁড়াইল, সেখানে থাকিলে প্রতি মুহূর্ত্তে লোক ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ থেকে আকাশে মেঘ জমা হইতেছিল, এখন চারিদিক অন্ধকার নিরানন্দ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বাতাস বারুদ ও ধোঁয়ার পাশাপাশি পাল্লা দিয়া ছুটিতে লাগিল, কাদা-গোলা বৃষ্টি গুলিগোলার সঙ্গে তেরছাভাবে পড়িতে লাগিল। ঠিক সেই সময় আমাদের 'রিসার্ভ' দল কর্নেলের সঙ্গে মিলিবার হুকুম পাইল। গোলন্দাজদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া বাঁ দিকে 'মার্চ' করিতে সুরু করিলাম। পাথরের উপর দিয়া অতি কষ্টে চলিতেছি, তীব্র বাতাসে পতাকা এমন পতপত করিতে লাগিল যে ভয় হইল পাছে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। এমন সময় মাথার উপর একটা গোলা ফাটিল, তার টুকরাগুলা শূন্যে ছড়াইয়া গেল। পতাকার খানিকটা উড়িয়া গেল, একটি লোক মারা পড়িল এবং গোলার এক টুকরা আমাদের অনেক পিছনে এক উপত্যকার মাঝে গিয়া পড়িল।

কর্নেল ছিলেন ইওয়ায়্যামা পাহাড়ের মাথায়, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া শত্রু নিঃসন্দেহ বুঝিল সেখানেই আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত, তাই বুঝিয়া তারা পাহাড়ের উপর শিলা-বৃষ্টির মত গোলা ফেলিতে লাগিল। কর্নেল আওকি শত্রুর পানে এক-দৃষ্টে চাহিয়া অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর কাছে গিয়া পতাকা ছিঁড়িয়া যাওয়ার খবর দিলাম, তিনি কেবল বলিলেন, বটে! ক্ষণকাল পরে বলিলেন, ঠিক ম্যানুভারের মত, কি বলো?

বেলা দুইটা। এখনো লড়াইয়ের মীমাংসা হয় নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায়

আমাদের হতাহতের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই সময়ে আমাদের বাঁ দিকের এক অংশ আগাইতে সুরু করিল। আমাদের দলও আগে যাইবার আদেশ পাইল। অমনি সমস্ত লোক উঠিল একটা কালো দেওয়ালের মত এবং হু হু করিয়া শত্রুর কামানের মুখের কাছে গিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া রুশেরা তোপের বহর আরও বাড়াইয়া দিল। আমাদের মধ্যে যারা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল তারা ছিন্নভিন্ন হইল, যারা যায় নাই তারা আগেই মরিয়াছে। সাব্-লেফটেন্যাণ্ট হাচিদার বুকে গুলি লাগিয়াছে, তবুও সে সামনে চলো, সামনে চলো, বলিয়া হাঁকিতেছে; ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে, তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। তার আঘাতের কথা সৈনিকেরা জানেও না। শত্রুর পানে খানিকটা পথ দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে 'বান্জাই' বলিয়া সে মরিয়া গেল।

হাচিদা আহত হওয়ার আগে তার এক সৈনিকের ডান হাত চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও সে রণে ক্ষান্ত দেয় নাই। লেফটেন্যাণ্ট তাহাকে শুশ্রূষা-শিবিরে পাঠাইতে চাহিলে সে বলিল, আজ্ঞে এ অতি তুচ্ছ আঘাত! আমি এখনো বেশ লড়তে পারি! এই বলিয়া বোতলের জলে ক্ষত স্থান ধুইয়া তার উপর তোয়ালে জড়াইয়া সে ছুটিয়া চলিল বাঁ হাতে বন্দুক ধরিয়া। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছিয়া নায়ক হাচিদার পাশেই সে নিহত হইল।

শেষ পর্য্যন্ত কর্নেল আওকির 'রিসার্ভ' দুই দল পদাতিক ও একদল গুনীয়ারে আসিয়া ঠেকিল। সকাল থেকে আমাদের গোলন্দাজেরা শত্রুর কামান থামাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফল হয় নাই। শত্রু অধিকৃত আসল জায়গা এখনো অক্ষত আছে।

দিন শেষ হইল। যুদ্ধের দৃশ্য মলিন অন্ধকারের পর্দ্দায় ঢাকা পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধরিয়াছে, রাত্রির বিষাদ দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইল।

পাহাড়ে ও উপত্যকায় শত শত মৃতদেহ ছড়াইয়া আছে, অন্ধকারের গায়ে শত্রুর কেল্লাগুলো মাথা তুলিয়া যেন নিষ্ফল আক্রমণে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। রাত্রে কামান ও বন্দুক অবিরাম চলিতে লাগিল, 'ষ্ট্রেচারের' অভাব, তাই হতাহতকে তাঁবুর উপর ফেলিয়া বহন করা হইতেছে। অক্ষত আমরা মূকমৌন মৃত্যুকবলিতদের পাশে বসিয়া নিদ্রাহীন চোখে দিবাগমের অধীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

১৫

## ভাইপোষান্ অধিকার

পরদিন প্রত্যূষে পদাতিকদলের পথ খোলসা করিবার জন্য সমস্ত জাপানী কামান তোপ দাগিতে সুরু করিল। গোলা বর্ষণ আগের দিনের চেয়েও প্রবল, অনুপাতে শত্রুর জবাবও তেমনি। রুশের কেল্লার এই অদ্ভুত দুর্ভেদ্যতার কারণ কি? তাদের খাতের সামনে পাহাড়, উপরে তক্তার ছাউনি—নিরাপদে লুকাইয়া ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তারা গুলি চালায়, আমাদের বিস্ফোরক গোলায় তাদের ক্ষতি হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের দ্রুতবর্ষী কামান ও 'মেশিন্-গান' সাজানো আছে—তার দ্বারা সব দিক থেকেই আমাদের উপর গোলা ফেলা যায়; আর সেই ভয়ানক কামানগুলো কঠিন পদার্থে তৈরি, কঠিন আবরণে সুরক্ষিত। তার উপর, আমাদের পাহাড়ের পাশ ও তাদের পাহাড়ের উল্টা পাশে মিলিয়া একটা শিলাময় উপত্যকা সৃষ্টি হইয়াছে—তার দেওয়ালগুলো প্রায় খাড়া হইয়া ওঠায় অমানুষিক চেষ্টা ছাড়া সেখানে নামা ওঠা সম্ভব নয়।

কামানের কাজ যতক্ষণ ঠিকমত না হয় ততক্ষণ বন্দুক চালাইয়া ফল নাই। যেমন করিয়া হোক শত্রুর 'মেশিন্-গান' অকেজো করা চাই। বন্দুক কাজে লাগাইতে না পারিলে মানুষকে গুলির মত ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই—অর্থাৎ গুলি যেখানে গিয়া আঘাত হানিতে অক্ষম মানুষ সেখানে গিয়া আঘাত করিবে! অচিরে সেই আদেশ আসিল। আমাদের রেজিমেণ্টের পঞ্চম, সপ্তম ও দশম দল হুড় হুড় করিয়া উপত্যকার মধ্যে নামিয়া পড়িয়া শত্রুকে ভীষণ আক্রমণ করিল। রুশ গোলন্দাজেরা এতক্ষণ আমাদের কামান লক্ষ্য করিয়া গোলা ছাড়িতে-ছিল, এবার তারা এই অসম্ভব-প্রত্যাশী ধাবমান সৈন্যশ্রেণীর উপর কামানের মুখ ঘুরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 'মেশিন্-গান' ও কেল্লার পদাতিক একযোগে সেই দুঃসাহসী দলের উপর অগ্নি বর্ষণ সুরু করিল। কিন্তু সেনাদল ভ্রূক্ষেপ করিল না, হুহুঙ্কারে ঝড়ের মত তারা ছুটিয়া চলিল—কামান গর্জ্জনের সঙ্গে তাদের সেই হুঙ্কার মিশিয়া শত বজ্র নির্ঘোষের মত শুনাইতে লাগিল। দানবের মত তারা লড়িতে লাগিল—আহত নায়কের খোঁজ লইল না, মৃত সঙ্গীর পানে তাকাইল না। মৃত ও মরণাপন্নের উপর দিয়া ছুটিয়া বা লাফাইয়া জীবিতেরা অবশেষে শত্রুর নিকটে গিয়া পৌঁছিল। সমুখে প্রকৃতির অচল বাধা—খাড়া পাহাড়ের আড়াল। পিছনে সাথীদের অর্দ্ধেক গতপ্রাণ—পাহাড়ের ধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। একদৃষ্টে শত্রুর পানে চাহিয়া সেখানে তারা দাঁড়াইয়া রহিল—আর কিছুই করিতে পারিল না।

গোলাগুলির ধারাবর্ষণের মাঝ দিয়া যখন তারা যাইতেছিল তখন মনে হইতেছিল যেন ফিকা পাণ্ডুর ছায়ার দল গাঢ় ধোঁয়ার মাঝ দিয়া চলিয়াছে। দেখা গেল তাদের মধ্যে কেহ কেহ অতিকায় গোলার ঘায়ে শূন্যে উড়িতেছে। তাদের দেহ তুলিয়া লওয়ার পর দেখা গেল

কোনো কোনো সৈনিকের গায়ে আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু গায়ের চামড়া আগাগোড়া বেগুনে হইয়া গেছে। দেহ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমির উপর পড়ায় এমন হইয়াছে।

প্রকাণ্ড মন্দিরের ঘণ্টাকে একটা আলপিন দিয়া ঘা দিবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়, শত্রুর প্রবল বাধার মুখে আমাদের গোলাবর্ষণের ফলও তেমনি হইল। এমনিভাবে চলিলে হয়ত আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। তাই নিঃশেষে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের শেষ চেষ্টা করিতে হইল। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শীঘ্রই আদেশ দিলেন—

এই যুদ্ধের সূচনা হইতে নায়ক ও সৈনিকদের বিক্রম উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আজ অপরাহ্ণ পাঁচটায় তাইপোযানের পূর্ব্ব দিকে আমাদের 'ব্রিগেড' শত্রুকে আক্রমণ করিবে। সমগ্র গোলন্দাজবাহিনী তোপ দাগিবে, তার ফলে সুযোগ উপস্থিত হইলেই বাঁ দিকের দল দ্রুতগতি আক্রমণ করিয়া শত্রুকে অভিভূত করিয়া পরাস্ত করিবে। তখন তোমার রেজিমেণ্ট তোমাদের সমুখের শত্রুর ঘাটি অধিকারের প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্য করিবে আশা করি!

কিছুক্ষণ পরেই এক তরুণ সেনানায়কের আবির্ভাব—তার হাতে এক বোতল বীয়ার। আগের দিন থেকে পানাহার জোটে নাই বলিলেও চলে, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বীয়ারের বোতল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ভাবিতে লাগিলাম, এ ব্যক্তি কে হইতে পারে? নিকটে আসিলে তাহাকে চিনিলাম—দ্বিতীয় ব্যাট্যালিয়নের লেফটেন্যাণ্ট কান। ...

"কেমন, আজব চীজ নয় কি এই বীয়ার? কাল থেকে বেণ্টে এই বোতল বয়ে বেড়াচ্ছি শত্রুর এলাকায় 'বান্‌জাই' পান করার জন্যে! এস ভাই সব, এক সঙ্গে পান করি—বিদায়ের পাত্র! তোমাদের কাছ থেকে অনেক স্নেহ পেয়েছি—ঠিক করেছি আজ সুন্দরভাবে মরবো..."

এমনি সব কথা তরুণ নায়ক খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে বলিতে লাগিল, কিন্তু সে যে রহস্য করিতেছে না তাহা কারও বুঝিতে বাকি রহিল না। অ্যালুমিনিয়াম পাত্র সোনালী সুরায় পূর্ণ করা হইল, তারপর সেই পাত্র সকলের হাতে হাতে ঘুরিয়া আসিল। পান করার সময় সকলের মুখে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। তারপর লেফটেন্যাণ্ট ক্কান খালি বোতলটা তুলিয়া ধরিয়া হাঁকিল, সকলের কুশল প্রার্থনা করি! তারপর মৃত সৈনিকদের কবর দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। কেমন করিয়া বুঝিব সেই তার শেষ বিদায়? শত্রুর এলাকায় 'বান্‌জাই' হাঁকিবার আনন্দ লাভ করার আগেই সে মৃত্যুর গহনে প্রবেশ করিল। পরে শুনিয়াছিলাম, মৃতের কবর দেওয়ার কাজ তদারক করার সময় সে বলিয়াছিল, ওদের ওপর ভালো করে' মাটি চাপাও, কারণ আমার পালাও এল বলে'!

মৃত্যুর পদধ্বনি সে কি শুনিতে পাইয়াছিল?

বেলা পাঁচটা। আমাদের সমস্ত গোলন্দাজবাহিনী একযোগে অগ্নি বর্ষণ সুরু করিল এবং সমস্ত পদাতিক তার সঙ্গে যোগ দিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্ধকার হইয়া উঠিল, গোলা ফাটিতে লাগিল, গুলি ছুটিতে লাগিল, মনে হইল গিরিদরি ছিন্ন হইল বা। পদাতিকেরা গুলি চালায় আর ছুটিয়া যায়, আবার থামিয়া গুলি চালায়, তারপর সামনে লাফাইয়া পড়ে। শত্রুর গোলার মুখে তারা সিধা যাইতে পারিতেছে না। কখনো মরণাহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে কেবল 'লেফটেন্যাণ্ট' বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাহিতেছে, কখনো বা কেবল 'আ' বলিয়া মরিতেছে।

অবশেষে আমাদের প্রথম ব্যাটালিয়ন শত্রুর থেকে কুড়ি গজ আন্দাজ তফাতে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু সামনে দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড়, তাহাতে পা রাখিবার ঠাঁই পর্য্যন্ত নাই। পাহাড়ে ওঠার জন্য

অধীর অথচ উঠিতে একেবারে অক্ষম, এমন অবস্থায় পাশ থেকে শত্রুর গুলি অবিরাম ঝরিতে লাগিল। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমাদের দ্বিতীয় দল রুশেদের 'মেশিন্-গানের' মুখে দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। একটা গুলি কাপ্তেন মাৎসুমারুর অসিফলক ভেদ করিয়া তার বাঁ গাল ছুঁইয়া ছুটিয়া গেল। আমাদের কামানের গোলা শূন্যে রোসনাই সৃষ্টি করিল বটে, কিন্তু শত্রুর কেল্লার প্রায় কোনো ক্ষতিই করিতে পারিল না। 'শ্র্যাপ্‌নেলের' ( চোঙের মত গুলিভরা ধাতুময় আধার ) কর্ম্ম নয়, শত্রুর খাতের ( trench ) ছাউনি চূর্ণ করার জন্য গোলাকার 'শেল্' ফাটানো দরকার। গোলন্দাজের কাছে দূতের পর দূত যাইতে লাগিল আদেশ লইয়া—আমাদের পদাতিকদের প্রাণ বিপন্ন হয় হোক, তবুও গোলাকার 'শেল' যত ঘনঘন সম্ভব ছাড়িতে থাকো! কিন্তু দূতেরা যথাস্থানে আদেশ বিলি করার আগেই প্রত্যেকে মারা পড়িল—একজনও প্রাণ লইয়া ফিরিল না।

সাতটা বাজিল, আটটা বাজিল, শেষে ন'টা বাজিল, তবুও আমাদের অবস্থার কোনো উন্নতি নাই। প্রথম ব্যাট্যালিয়ন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর তামাই সাংঘাতিকভাবে আহত; তাঁর সহকারী লেফটেন্যাণ্ট কান্ আক্রমণের পথের খোঁজ করিতেছিল, এমন সময় তার মাথার মধ্যে গুলি লাগিল—ফিরিয়া সংবাদবাহককে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। তৃতীয় ব্যাট্যালিয়ন শত্রুর কাছে পৌঁছিল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, আর কিছু করিতে পারিল না। প্রতিমুহূর্ত্তে সে-দলের হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। আমাদের অবস্থা ক্ষুদে মাছের মত—অতিকায় তিমি তাহাকে অচিরে গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু, আমাদের সৈন্যশ্রেণীর প্রতিজ্ঞা যেমন দুর্জ্জয় সাহসও তেমনি অদম্য—শত্রুকে আয়ত্ত করা যতই

কঠিন হইতে লাগিল ততই তাদের রোখ বাড়িয়া চলিল, ততই নূতন নূতন উপায় তারা আবিষ্কার করিতে লাগিল। সকল ব্যাট্যালিয়ন, বিশেষ করিয়া প্রগমট, কুড়ুল দিয়া পাথর ভাঙিয়া, সেগুলি উপর উপর থাক দিয়া পা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু কাজ সোজা নয়, শত্রুর এত কাছে যে দুই পক্ষই যেন দুই বাঘ, দাঁত বার করিয়া পরস্পরকে ছিঁড়িয়া ফেলার ভয় দেখাইতেছে। রুশেরা আমাদের কাজে বাধা দিবার খুব চেষ্টা করিতে লাগিল—কুড়ুলের একটু আওয়াজ হয় আর আগুনের জিভ বার হইয়া আমাদের আশপাশের জায়গাটা বুভুক্ষুর মত চাটিয়া লয়। তবুও তারই মধ্যে একরকম দাঁড়াইবার ঠাঁই তৈরি হইয়া গেল, আমরা এবার একযোগে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রের উপর অস্তগামী চাঁদের বিষণ্ণ ম্লান আলো। আমাদের শিবিরের আধখানা সেই আলোয় একখানি black and white ছবির একাংশের মত দেখাইতেছে। দ্বিতীয় ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর উচিনো আমাদের কর্নেলের কাছে এই লিপি পাঠাইলেন—

"আমাদের ব্যাট্যালিয়ন আক্রমণ করতে চলেছে—আশা করছি আমরা নিঃশেষে ধ্বংস হব। আপনারাও আক্রমণ করুন। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় কর্নেল এ আক্রমণের বিজয়ী নায়ক হতে পারবেন এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধপতাকা শত্রুর দুর্গপ্রাচীরে স্থাপিত হবে। আমার বিদায়-নমস্কার গ্রহণ করুন!"

তারপর বামদিকে বহুদূরে শুনিতে পাইলাম তূরীতে 'কিমিগায়ো'র গম্ভীর সুর বাজিয়া উঠিল। আমাদের উপত্যকার আকাশে চাঁদ ভাসিতেছে, জাতীয় সঙ্গীতের বিলম্বিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন অন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। সুরটি শুনিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং সম্রাট

অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিতেছেন! নায়ক ও সৈনিকেরা সিধা হইয়া দাঁড়াইল, তারপর অসীম সাহসে হুঙ্কার দিয়া হাতে পায়ে পাথর ও নুড়ির উপর দিয়া গিয়া শত্রুর বক্ষঃপ্রমাণ প্রাকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একেবারে সামনের দলে মেজর মাৎসুমুরা দীপ্তচোখে বজ্রকণ্ঠে হুকুম করছেন—ছুটে চলো সামনে! আবার তুরীতে 'কিমিগায়ো' বাজিয়া উঠিল, দলের পর দল 'বান্‌জাই' হাঁকিতে লাগিল, ভৈরব নাদে পাহাড় কম্পমান। পাহাড়ের মাথায় কিরিচে কিরিচে সংঘর্ষ আগুনের ফুলকি ছড়াইতেছে। দলের পর দল ছুটিয়া আসিতেছে অতিকায় ঢেউয়ের মত। রুশেরা টলিতেছে—মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই আর কতক্ষণ চলে?

অবশেষে, বেলা আটটায়, পূবের আকাশ যখন লালে লাল, তখন তাইপোয়ান্ আমাদের সম্পূর্ণ দখলে আসিয়া গেল।

আমাদের নূতন শিবিরের অনেক উঁচুতে জাপানী পতাকা উড়িতেছে। দিকে দিকে 'বান্‌জাই' ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

১৬

## যুদ্ধশেষে

তাইপোয়ান্ সম্পূর্ণ দখল হওয়ার আগে আমরা একটানা আটান্ন ঘণ্টা লড়াই করিয়াছিলাম। সে সময়ের মধ্যে অবশ্য পানাহার ও নিদ্রা হয় নাই। শত্রু সহজে পরাজয় স্বীকার করে নাই, অসীম বিক্রমে লড়িয়াছিল। আমাদের এই জয়ে যুদ্ধের পরবর্ত্তী ধারা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য হইল।

নান্‌শানের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হয় চার হাজার। এ পর্য্যন্ত উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেছিল, কিন্তু তাইপোষানের তুলনায় নান্‌শান্ সস্তাদরে পাওয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। নান্‌শানে শত্রুর সমুখে ছিল বিস্তীর্ণ ঢালু জমি; আমাদের সৈন্যদল সেখানে থাকায় নিরাপদ স্থান থেকে শত্রু তাদের উড়াইয়া দিয়াছিল। তাইপোষানের আশপাশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা—কেবল খাড়া পাহাড় আর গভীর উপত্যকা। সেখানে সহজেই আত্মরক্ষা করা বা লুকাইয়া থাকা সম্ভব। তবুও সেখানে আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা নান্‌শানের সমান হইয়াছিল। তাইপোষান যুদ্ধের ভীষণতা ইহা হইতে অনুমান করা যায়।

একটুখানি জায়গার জন্য তিন দিন ধরিয়া লড়াই চলে। পিছন থেকে কোনো খাদ্যই আনানো যায় নাই—কেবল শুকনো বিস্কুট চিবাইয়াছি। এক ফোঁটা জল পাই নাই, এক মুহূর্ত্ত ঘুমাই নাই। উদ্বেগ ও উত্তেজনার আতিশয্যে আহার নিদ্রার কথা মনেই ছিল না। এক খাওয়ার কষ্ট ছাড়া রুশেদের অবস্থাও তেমনি। তাদের পরিত্যক্ত কালো রুটি আর জমাট চিনি পাইয়া আমাদের লোকেরা আহ্লাদে আটখানা।

যুদ্ধশেষে আমাদের প্রথম অনুভূতি—নিদ্রাবেশ। তখন মনে হয় আর কিছুরই দরকার নাই, কেবল ঘুমাইতে চাই। মৃত সঙ্গীদের কথা বলিতে বলিতে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আলোচনা করিতে করিতে জনে জনে ঢুলিতে সুরু করিল, তারপর শত্রুর খাতের ছাউনির তলায় শুইয়া নিরীহ শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িল। রক্তে মাখা-মাখি হইয়া নিহত রুশ সৈনিকেরা চারিদিকে পড়িয়া আছে, তাহাতে তাদের গভীর ঘুমের ব্যাঘাত নাই। পানাহারের চিন্তাও

লোপ পাইয়াছে—তাদের নাক ডাকিতেছে সুদূর বজ্রধ্বনির মত। মাঝে মাঝে শত্রুর গুলি ছুটিতেছে—মশা ভন ভন্ করিলে যেটুকু ঘুমের অসুবিধা, তাহাতে সেটুকুও হইতেছে না।

যুদ্ধের মহিমা প্রকাশ পায় কেবল গোলাগুলি বর্ষণের মাঝে, কিন্তু তার বীভৎসতা সব চেয়ে ভাল দেখা যায় যুদ্ধ থামিবার পর। মৃত্যুর পক্ষপাত নাই—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে তার ছায়া বিস্তারিত। ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের শেষে রক্তমাখা অগণ্য মৃতদেহ ঘাসের উপর আর পাথরের মাঝে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকে। নান্‌শানে নিহত সৈন্য দেখিয়া আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায় চোখ না ঢাকিয়া পারি নাই। এখানকার দৃশ্যও তেমনি বীভৎস, তবুও সেবারের মত আঁতকাইয়া উঠিলাম না। কোনো কোনো সৈনিকের মুখ ও মাথা চূর্ণ হইয়া গেছে, মস্তিষ্কের সঙ্গে ধূলামাটির মাখামাখি—কাহারও বা নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া বার হইয়াছে, তা থেকে রক্ত ঝরিতেছে।

নান্‌শানে শত্রুর মৃতদেহ দেখিয়া তাদের জন্য মায়া হইয়াছিল, তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়াছিল, কিন্তু এখানে তাদের ঘৃণা করিতে লাগিলাম। কেন, তাদের কি দোষ? তারাও কি যোদ্ধা নয়, তারাও কি কর্ত্তব্য করিতে গিয়া মরে নাই? তাদের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধের ফলে আমাদের এতগুলি সৈনিকের প্রাণ নষ্ট হওয়ায় আমাদের মনে শত্রুর প্রতি এই ঘৃণার সঞ্চার। কেন তারা প্রাণপণে বাধা দিল, কেন সহজে হার মানিল না? কেন তারা খাতের মধ্যে নিরাপদে দাঁড়াইয়া গর্ত্তের ভিতর দিয়া বন্দুকের নল বাহির করিয়া আমাদের সৈনিকদিগকে হত্যা করিল? যুদ্ধের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে, তাহারা সাহসী ও দুর্জ্জয় শত্রুর মৃতদেহ দর্শনে

এই ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি অক্লেশে বুঝিতে পারিনে, যদিও এ মনোভাবের মূলে কোনো যুক্তি নাই।

একটি খাতের মধ্যে দেখা গেল এক রুশ সৈনিক মরিয়া পড়িয়া আছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সম্ভবত প্রথম আঘাতের পরও সে সাহসের সঙ্গে লড়িয়াছিল, শেষে আমাদের দ্বিতীয় গুলি তার প্রাণ সংহার করিয়াছে। যে সব সাহসী রুশ যোদ্ধা খাতের ভিতর থেকে ছুটিয়া বার হইয়াছিল, নিশ্চয় তাদেরই মৃতদেহ ওই বক্ষঃপ্রমাণ প্রাকারের পাশে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। আমরা হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়াতে ইহারাই খাতের বাহিরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কিরিচ ও ঘুসি দিয়া লড়িয়াছিল। ইহাদের কারও কারও বুকের মধ্যে স্ত্রী পুত্রের রক্তমাখা ছবি পাওয়া যায়।

যুদ্ধ শেষ হইবার পরই আমার ভৃত্য রুশেদের একটি ঝুলি (haversack) লইয়া উপস্থিত। তার ভিতর থেকে রকমারি জিনিস বার হইল—মায় এক সুট চীনা পোষাক। সেটি যেমন আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিল তেমনি তার সাহায্যে একটা হদিসও মিলিল। রুশের সন্ধানী দূতেরা চীনা সাজিয়া আমাদের খোঁজখবর করিতে আসিত!

এই যুদ্ধে আমরা কতকগুলি অকেজো 'মেশিন্-গান্' দখল করি। এই যন্ত্রকে আমরা সব চেয়ে বেশি ভয় করিতাম। মস্ত একখানা লোহার পাত ঢালের কাজ করে, তার মাঝ দিয়া লক্ষ্য স্থির করা হয়। উঁচু দিকে, নীচু দিকে, ডাইনে বাঁয়ে অস্ত্র চলাফেরা করিবার সময়ও ঘোড়া টানা চলে। মিনিটে ছ'শ'র বেশি 'বুলেট' স্বতশ্চালিতভাবে নিঃসারিত হয়, যেন একটা দীর্ঘ অখণ্ড 'বুলেটের' শিক কামানের মুখ নিক্ষেপ করিতে থাকে। 'হোস্' বা ক্যাম্বিসের

নল দিয়া যেমন করিয়া রাস্তায় জল ছিটানো হয়, ইহা দ্বারা তেমনি করিয়া 'বুলেট' ছিটানো চলিতে পারে। চালকের ইচ্ছামত ইহা অল্প বা বেশি জায়গা ব্যাপিয়া নিকটে বা দূরে গুলি চালাইতে সক্ষম। কেহ এই ভীষণ মারণাস্ত্রের লক্ষ্যস্থল হইলে বিদ্যদ্বেগে তিন চারিটি গুলি তার দেহের একই জায়গা ভেদ করিয়া মস্ত আঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে। বন্দুকে যেমন 'বুলেট' ব্যবহৃত হয় এ গুলিও তত বড়। একটি লম্বা ক্যাম্বিসের 'বেণ্টে' এমনি অনেক গুলি পরানো থাকে, সেই 'বেণ্ট' 'মেশিন্ গানের' কামরায় (chamber) ভরা হয়—বায়স্কোপের ফিল্মের মত ঐ 'বেণ্ট' চালিত হয়। কাছ থেকে শব্দটা হয় অতি দ্রুত ট্যাপ, ট্যাপ, ট্যাপ, কিন্তু দূর থেকে শুনিলে মনে হয় যেন স্তব্ধ নিঝুম নিশীথ রাতে কলের তাঁত চলিতেছে। শব্দটা ভয়ানক—শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

রুশেরা এই যন্ত্র চালনায় বিশেষ পটু। যতক্ষণ না আমাদের সৈনিকেরা খুব কাছে আসে ততক্ষণ তারা চুপ করিয়া থাকে, তারপর যেই আমরা সোল্লাসে 'বান্‌জাই' হাঁকিতে উদ্যত হই, অমনি এই মারাত্মক অস্ত্রের সংহারের ঝাঁটা দিয়া আমাদিগকে ঝাঁটাইতে সুরু করে; তার ফলে দেখিতে দেখিতে মড়ার ঢিপি ও পাহাড় রচনা হইয়া যায়। তাইপোসানের যুদ্ধের পর শত্রুর এলাকায় আমাদের এক সৈনিকের দেহ পাওয়া যায়, তার নাম হোদো, সে দ্বিতীয় দলের একজন "ক্ষীণ-আশা" সম্প্রদায়ের চর। তার দেহে সাতচল্লিশটা গুলি, কেবল ডান হাতেই পঁচিশটা! অপর এক রেজিমেণ্টের সৈনিকের গায়ে সত্তরটার বেশি গুলি লাগিয়াছিল!

এখানে শত্রুর চার পাঁচটি যুদ্ধের কুকুর নিহত দেখিতে পাই। বলিষ্ঠ, গায়ে ছোট ছোট বাদামী রোঁয়া, মুখের চেহারা চালাক চতুর।

আমাদের গুলিতে তারা মরিয়াছে—ইতর প্রাণী হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মানের ভাগ লইয়াছে।

যুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্যই রুশেরা এই কুকুরগুলিকে তালিম দেয়, নানা কাজে এদের নিযুক্ত করে। শুনিতে পাই কখনো কখনো ইহারা চরের কাজও করিয়া থাকে।

এই যুদ্ধের পর আমাদের দলের লোক একখানি পত্র কুড়াইয়া পায়। সেখানি রুশ-নায়ক জেনারেল ফকের লেখা। তাহাতে লেখা ছিল—

"জাপানী সৈন্যদল 'মার্চ' করিতে জানে কিন্তু পিছু হটিতে জানে না। কোনো জায়গা একবার আক্রমণ সুরু করিলে ভীষণ একরোখা ভাবে লড়িতে থাকে। এটা নয় অনুমোদন করিলাম, কিন্তু যখন অবস্থা-গতিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়, তখন কখনো কখনো পিছু হটিলেও লাভ হইতে পারে। কিন্তু বিপদ যতই থাক, জাপানীরা আক্রমণ চালাইবেই, কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। হয়ত জাপানী লড়াইয়ের কায়দা যাঁরা রচনা করিয়াছেন, তাঁরা পিছু হটার কায়দা সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নাই!"

১৭

## প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির

যুদ্ধের উত্তেজনায় আর কিছু ভাবিবার সময় পাই নাই, এখন বন্ধু ডাক্তার য়্যাসুইয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি নিরাপদে আছেন ত? সেদিন সন্ধ্যার আকাশে ঘনঘটা, আমি তাইপোষানের তলায় ছোট একটি স্রোতস্বতীর ধারে ধারে 'উইলো' গাছের তলায় একলা বেড়াইতেছি। ভাবিতেছিলাম, আহতের শুশ্রূষায় ডাক্তার নিশ্চয়ই

খুব ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ সেনানায়কের জুতার শব্দ কানে পৌঁছিল, ফিরিয়া দেখি, তিনি পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"ডাক্তার য়্যাসুই!"

"লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই!"

"বেশ ভালো আছেন?"

পরস্পরে সানন্দে করমর্দ্দন করিলাম। উভয়ের কুশলতার উল্লেখের পর সম্প্রতিকার যুদ্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কাপ্তেন মাৎসুনারু আহত হইয়াছিলেন, তিনিও আসিলেন। তাঁর কাঁধে সেই গুলির-ঘায়ে-বাঁকা ফলকে-গোল-জানালা-কুটানো তলোয়ার। তিনিও সাগ্রহে আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন। ডাক্তার য়্যাসুই প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরের ( first aid station ) নিখুঁত বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

যুদ্ধের সময় প্রায়ই শত্রুর গোলা চীনাদের বাড়ির কাছে পড়িত। আমাদের সাময়িক শুশ্রূষা-শিবিরের সঙীন অবস্থা। একবার একটা মস্ত 'শেল্' ছাত ফুঁড়িয়া উঠানে ফাটিয়া যাওয়ার ফলে অনেক আহত সৈনিক টুকরা টুকরা হইয়া গেল। বাড়ির দেওয়ালে ও থামে তাদের রক্তমাংসের ছাপ পড়িল। আর একবার বাহকেরা বহুকষ্টে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি আহত সৈনিককে আনিয়া সবে উঠানে নামাইয়াছে, এমন সময় শত্রুর একটা গুলি ছিটকাইয়া আসিয়া বেচারাকে শেষ করিয়া দিল। শুশ্রূষা-শিবিরের সে সব হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। নরকের বিভীষিকার সঙ্গে তার তুলনা করিতে ইচ্ছা করে।

একজন আহত লোককে আনিলেই, তা সে কর্ম্মচারীই হোক আর সাধারণ সেনাই হোক, ডাক্তার ও হাসপাতালের লোকেরা তার প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহতের সংখ্যাও দ্রুত থেকে দ্রুততর বাড়িতে থাকে,

তখন ডাক্তার ও তার সহকারীদের ক্ষমতায় কুলায় না। একজনের ব্যবস্থা করিতে করিতে হয়ত দেখিতে পায় অপর একজন হাঁপাইতে সুরু করিয়াছে, গায়ের রংও ফ্যাকাশে হইয়া উঠিতেছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখে যখন কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি দিতেছে তখন হয় ত তৃতীয় ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবার উপক্রম। একজনের ক্ষতে যথারীতি ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করার আগেই দশ পনেরো জন নূতন আহত আসিয়া হাজির।

ডাক্তারদের চারিদিকে মারাত্মক-রকম আহত সৈনিক। তারা শার্টের আস্তীন গুটাইয়া সারা পোযাকে রক্ত মাখিয়া প্রাণপণে খাটিতেছে। কারও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছে, যাদের হাড় ভাঙিয়াছে তাদের splint বাঁধার ব্যবস্থা। অবশ্য তাড়াহুড়ার ব্যাপার—সাময়িক সাহায্য মাত্র; তবুও ডাক্তারদের নিশ্বাস ফেলার সময় নাই। করিবার এত আছে অথচ কতটুকুই বা করা সম্ভব, ভাবিতে ভাবিতে আর চারিদিকের সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মাথা খারাপ হইবার যোগাড় হয়।

কিন্তু এই বাড়িতে বা ওই উঠানে যারা শায়িত, তারা সকলেই সাহসী সৈনিক। শুশ্রূষার বিলম্ব হইলে বা তা যথেষ্ট না হইলেও তাদের নালিশ নাই। বিশেষ কোনো অভিলাষ বা অসন্তোষ তারা প্রকাশ করে না। যুদ্ধের উষ্মায় ও উত্তেজনায় এখনো তারা আচ্ছন্ন, তাই সৈনিকের হুঙ্কার বা কামানের আওয়াজ শুনিতে পাইলেই তারা ছুটিয়া যুদ্ধে যাইতে চায়। তাদের শান্ত করিয়া স্থির করিয়া রাখিতে ডাক্তারদের রীতিমত বেগ পাইতে হয়। মাথায় চোট লাগার ফলে যারা পাগল হইয়াছে, তারা মৃদু কণ্ঠে 'তেন্নো হেইকা বান্‌জাই' (সম্রাট দীর্ঘজীবন লাভ করুন) বা 'রুশকি' (রুশ) বলিয়া টলিয়া টলিয়া বেড়ায়, ডাক্তার চাপিয়া ধরিয়া থাকিলে তারা রাগে জ্বলিয়া ওঠে,

বলে—তুই 'রুশকি'! এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে অতিমাত্রায় রক্তস্রাব হইয়া শীঘ্রই তারা মারা পড়ে।

সাতাশ তারিখে আহতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। শুশ্রূষা-শিবিরের সম্মুখের গোলাবাড়ির উঠান একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ডাক্তার যখন একজনকে দেখিতেছে তখন পিছন থেকে তার ইজেরে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখে এক ব্যক্তি তার পায়ে ঠেস দিয়া নিরীহ শিশুর মত চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িতেছে। আমার প্রাণ রক্ষা হবার নয়, আমাকে এখনি মেরে ফেলুন—ডাক্তারকে দুই হাতে চাপিয়া একজন যন্ত্রণায় চেঁচাইতেছে। একজন সার্জ্জেণ্ট হাতের উপর ভর দিয়া পা দুখানা টানিতে টানিতে ডাক্তারের কাছে আসিয়া উপস্থিত। সজল-চোখে সে মিনতি করিতেছে—দেখুন, ওই যে লোকটি, ও আমারই দলের; ও যে-ভাবে হাঁপাচ্ছে হয় ত কোনো ফল হবে না, তবুও দয়া করে' আর একবার ওকে দেখবেন কি? সেই সার্জ্জেণ্ট নিজেই খুব আহত, তবুও তাঁবেদারের কষ্ট সহিতে পারিতেছে না!

সেদিন সকালবেলায় শুশ্রূষা-শিবিরে বিবর্ণ পাংশুমুখে এক সৈনিক আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার! আহত?" কোনো জবাব নাই, বৃথাই তার ঠোঁট নড়িতে লাগিল। আবার ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি? না বললে আমি বুঝব কি করে'?" তবুও সে নিরুত্তর। ডাক্তারের ভারি অদ্ভুত ঠেকিল। লোকটির মুখের পানে লক্ষ্য করিতে সে তার উপর একটু রক্ত দেখিতে পাইল। ভাল করিয়া পরীক্ষার পর দেখা গেল ডান দিক থেকে বাঁ দিকের রগ এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া গুলি চলিয়া গেছে। তার ফলে তার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি দু-ই লোপ পাইয়াছে। বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার তখনি শুশ্রূষা সুরু করিয়া দিল। বেচারার হাতখানা

সযত্নে তুলিয়া লইতেই সে দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল—প্রতিহিংসা! দেখিতে দেখিতে তার দেহ কঠিন হইয়া গেল, তার যন্ত্রণারও অবসান হইল—লড়াইয়ের সাধ আর মিটিল না।

একদিন এক আহত সৈনিক দুই হাত দুলাইতে দুলাইতে ছুটিয়া আসিল, যেন বিশেষ তাড়া।

"জোর লড়াই চলেছে! ভারি মজা! জায়গাটা দখল হ'ল বলে'!"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আহত?

"কোমরের কাছে একটু—"

ডাক্তার যুদ্ধের ফল জানিতে উৎসুক। বলিলেন, তুমি অনেক শত্রু মেরেছ নিশ্চয়? জখম হ'ল কাদের দিকে বেশি!

লোকটি চাপা গলায় বলিল, এবারও জাপানের দিকেই বেশি?

তারপর ডাক্তার তার কোমরের কাছে 'সামান্য আঘাত' পরীক্ষা করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। ডান দিকের উরুদেশের মাংস গোলার ঘায়ে বেমালুম অদৃশ্য হইয়াছে। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়াছে, কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় নাই—ইহারই গৌরবে সে অস্থির। জানেই না যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তার প্রাণের স্রোতেই ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছে। মহা উৎসাহে আনন্দে সে যুদ্ধের গল্প করিয়া চলিল।

"বেশ। এবার যেতে পারো। ব্যাণ্ডেজ করা হয়ে গেছে!"

ডাক্তারের কথায় লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু এক পা-ও চলিতে পারিল না। লড়াইয়ের উত্তেজনায় এমন অবস্থায়ও লোকে হাঁটিতে বা দৌড়িতে পারে, কিন্তু তার পর স্নায়ুগুলা একবার ঢিলা হইয়া গেলে হঠাৎ যন্ত্রণায় একেবারে কাবু হইয়া পড়ে।

যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে তখন ইতস্তত 'রেড্‌ক্রশ' নিশান যুদ্ধক্ষেত্রের আহতদিগকে আহ্বান করে। যে সব বীর যুদ্ধে মরিয়াছে, তারা এই

সেবাসঙ্ঘের কোনো সাহায্য পায় না, সমস্ত সুবিধাই ভোগ করে আহতেরা, তাই কখনো কখনো তাদের মনে হয়, নিহতের কাছ থেকে যেন কিছু চুরি করিতেছে! যুদ্ধ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুলি-বাহকেরা ডুলি কাঁধে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহতকে তুলিয়া তারা প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে লইয়া যায়। এই সব বাহকদেরও আসল যোদ্ধার মত নির্ভীক হওয়া চাই। গোলাগুলি তলোয়ার উপেক্ষা করিয়া আহতকে খুঁজিয়া বার করিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে হয়। এই বিপদসঙ্কুল সেবার ভার তাদেরই উপর ন্যস্ত আছে। শুধু তাই নয়, আপনাপন পরিমিত খাদ্যের ও মহামূল্য জলের ভাগও আহতকে দিতে হয়, যথাসাধ্য সাবধানে তাদের বহন করিতে হয় এবং সস্নেহে তাদের সান্ত্বনা দিতে হয়।

দেশের হাসপাতালে যে সব পীড়িত ও আহত সেনাকে ফেরত পাঠানো হয়, তাদের পোষাক সাদা, তারা ডাক্তার ও সেবিকাদের সস্নেহ সেবা শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে ব্যাপার অন্যরকম। সেখানে গ্রীষ্মকালে হতভাগ্য আহত সেনাকে ঝাঁক ঝাঁক মাছি আসিয়া আক্রমণ করে, তাদের নাকে মুখে পোকা পড়ে, কারও কারও হাত অকেজো হইয়া পড়ায় সেগুলোকে তাড়াইতেও পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও হাসপাতালের আরদালি আর কতটুকু সাহায্য করিতে পারে?—একশো আহতের পিছনে একজনমাত্র আরদালি। দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে, রাত্রে বৃষ্টিতে বা হিমে তারা খোলা পড়িয়া থাকে। কখনো কখনো দীর্ঘকাল এমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া তাদের অবস্থা অকথ্য নোংরা হইয়া ওঠে, তখন ক্ষতের পরিচর্য্যা করিবার আগে ঝরণার জলে ডুবাইয়া বুরুশ দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাদের দেহ সাফ করিতে হয়।

১৮

## অবিরাম চলা

প্রকৃতি তাইপোষানের কেল্লাগুলোকে প্রায় অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল, তা-ও যখন জাপানীর দখলে আসিল তখনো রুশেরা দমিয়া গেল না। কারণ তাইপোষানকে ঘিরিয়া তাদের আসল আত্মরক্ষার আয়োজন এখনো অব্যাহত আছে। দুই তিনটা পরাজয়ে এমন কি আসে যায়? এবার তারা কান্তাগান্ পাহাড়ে হটিয়া গিয়া সেখানে আক্রমণ প্রতিরোধের নূতন ব্যবস্থায় মন দিল—সেখানে তৃতীয়বার দাঁড়াইবার চেষ্টা হইবে। আমাদের একদিনের বিলম্বে উহাদের একদিনের সুবিধা। তাই দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর শ্রান্ত দেহের বিশ্রামের অবসর হইল না; আমরা শত্রুর পিছু পিছু অবিরাম ধাওয়া করিয়া চলিলাম বন্যাস্রোতের মত। উদ্দেশ্য, তাদের আত্মরক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাহাদিগকে তাড়াইয়া প্রধান কেল্লায় ঠেলিয়া তোলা।

প্রথমেই গুলিবারুদের অভাব পূরণ করা হইল, তার পর দলের পুনর্গঠন এবং শত্রুর অশ্বারোহী দলের সন্ধান। স্থির হইল পরদিন আমাদের সমগ্র সেনাবাহিনী একযোগে যাত্রা সুরু করিবে। ২৯ তারিখে হুচিয়াতুনের কাছে উপত্যকায় আমাদের রেজিমেণ্ট একটা অস্থায়ী আড্ডা গাড়িল। রাত তিনটায় ব্রিগেড্-সদর থেকে কর্নেলের কাছে আদেশ আসিল—এখনি লোক পাঠাইয়া কর্তব্য বুঝিয়া লও।

আমাকে সেই কাজে পাঠানো হইল। একজন আরদালিকে সঙ্গে

নিয়া নদীর ধার দিয়া দেড় 'রি' * ছুটিয়া চারটের কিছু আগে সদরে পৌঁছিলাম। কাজ শেষ হইলে মনে হইল, যদি আরও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া শিবিরে ফিরিতে না পারি, তবে আমাদের রেজিমেণ্ট যথাসময়ে যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে না। সুতরাং হালকা হওয়া দরকার। অগত্যা সমস্ত পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া আরদালির হাতে দিলাম, তারপর এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাতে তলোয়ার ধরিয়া একেবারে দিগম্বরবেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। তখনো অন্ধকার, ভুল পথে না যাই সে সম্বন্ধে সতর্ক আছি। নদীর ধার দিয়া অবিরাম ছুটিতেছি, দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হঠাৎ এক জায়গায় 'পে-মাষ্টার' মিশিমার গলার আওয়াজ পাইলাম—তিনি আহার্য্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম—খাবারের আর দরকার নেই, এখনি আমরা যাত্রা করবো। আমার কথা শেষ হইলে পিছনে অনেক দূরে মিশিমার গলার আওয়াজ পাইলাম।

ভাগ্যক্রমে ভুল করিয়া পথ হারাই নাই। পাঁচটার দশ মিনিট আগেই আমাদের অস্থায়ী আড্ডায় পৌঁছিলাম। সৈন্যদল তখনি জড়ো হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করার আদেশ পাইল। যে আরদালির হাতে আমার পোষাক দিয়াছিলাম সে এখনো ফেরে নাই! অবশ্য গ্রীষ্মকালের প্রত্যূষে এমনি বিবস্ত্র অবস্থায় থাকায় দিব্য আরাম, কিন্তু এ ভাবে ত আর 'মার্চ' করা যায় না।, প্রথম কর্ত্তব্য বিনা পোষাকে সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনকার কর্ত্তব্যে যে পোষাক দরকার। প্রথম আরদালির সন্ধানে দ্বিতীয় আরদালি ছুটিল, কিন্তু তবুও তার দেখা নাই। শেষে যাত্রাকাল উপস্থিত, আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

---

* এক 'রি'=ইংরেজী ২॥ মাইল আন্দাজ।

হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে শেষ মুহূর্ত্তে পোসাক আসিয়া পৌছিল, উলঙ্গ অবস্থায় লড়াই করার গৌরব অর্জ্জন করা গেল না! এখন সেটা হাসির কথা, কিন্তু তখন রীতিমত ভাবাইয়া তুলিয়াছিল।

বোঝা গেল এবার লড়াই হইবে খোলা মাঠে। তার মানে প্রথম শ্রেণীতে চলিল skirmishers, তার পিছনে 'রিজার্ভ' দল—সমস্তই দস্তুরমাফিক সাজানো, যেন শান্তির সময়ে সখের লড়াই হইবে। কেননা আক্রমণের সময় এভাবে সৈন্যচালনা প্রায় অসম্ভব—তখন রণভূমির অবস্থা অনুযায়ী 'রিজার্ভের' সংখ্যা ক্রমশ বাড়াইতে হয়। এ পর্য্যন্ত শিলাময় পার্ব্বত্য ভূমিই আক্রমণ করা হইয়াছে; তাই যতদূর সম্ভব শত্রুর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা, যাহাতে সুযোগ পাইলেই একযোগে তাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া যায়। এই ধরণের আক্রমণে ড্রিলের কেতাবে লেখা সেনাসংস্থান সম্ভব নয়।

সে যাই হোক, এবার তাইপোষান পার হইলেই সেখান থেকে সমুচ্চ তাকুযান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল, তাই এবার প্রথম খোলা মাঠে লড়াইয়ের সম্ভাবনায় আমাদের বেজায় স্ফুর্ত্তি। শত্রু অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, সুযোগ বুঝিয়া আমরা হঠাৎ আক্রমণ করিলাম। তারা কতকটা বাধা দিলেও পায়ে-পায়ে হটিতে বাধ্য হইল। আমাদের রেজিমেণ্টের কেবল দুটি দল হাতে রহিল, বাকি সকলেই যুদ্ধে নামিয়া গেল। ক্রমে তারা শত্রুকে ঘেরিয়া ফেলিল; দুই দিকেই আক্রমণ করার ফলে মাঝখানের দলের হার হইতেই তারা দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন আর পিছু না হটিয়া উপায় রহিল না।

শেষ লক্ষ্যস্থলে তখনো পৌছি নাই, ভুট্টাক্ষেতের উপর দিয়া পতাকা হাতে ছুটিয়া চলিয়াছি, এমন সময় মেজর উচিনোর সঙ্গে দেখা। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ বাজপাখীর চোখের মত জ্বলিতেছে, তলোয়ারে ভর

দিয়া একখানা পাথরের উপর তিনি দাঁড়াইয়া। দেশে থাকিতে আমাদের রেজিমেণ্টের সদরে একত্রে ছিলাম, তাঁর চরিত্রের প্রভাব যাদের উপর খুব বেশি পড়িয়াছিল আমি ছিলাম তাঁদেরই একজন। লড়াইয়ের কায়দা সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা, অদম্য সাহস, সরল সংযত ব্যবহার আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ইনিই তাইপোয়ান আক্রমণের মাঝে কর্নেলকে সেই বিদায়-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই তাঁর বাছা বাছা দুই দল লোক লইয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছুটিয়া উঠিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী দলের আক্রমণের পথ খোলসা করিয়াছিলেন। তারপর আর সেই নির্ভীক নায়কের সঙ্গে দেখা হয় নাই। ভুট্টাক্ষেতে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল আবার যেন তাঁহাকে অসীম বিক্রমে লড়িতে দেখিতেছি। তাঁহাকে না ডাকিয়া পারিলাম না। ডাক শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, উৎসাহ দিয়া বলিলেন, পতাকার গৌরব আরো বাড়িয়ে তোলো!

সেদিন মধ্যাহ্নে ঈপ্সিত স্থান আমাদের সম্পূর্ণ দখলে আসিয়া গেল। এখন আমাদের সৈন্যশ্রেণীর বিস্তার হইল উত্তরে তুচেংতুন পাহাড় থেকে দক্ষিণে তাকুযানের পূর্ব্ব দিকের পাহাড় পর্য্যন্ত। সেই নবলব্ধ ভূমির উপর দাঁড়াইয়া দূরবীনের সাহায্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল।

এখান থেকে সর্ব্বপ্রথম পোর্ট-আর্থারের দুর্ভেদ্য দুর্গের আসল আক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা চোখে পড়িল। দক্ষিণে চিকুয়ান্‌যান্ থেকে সুরু করিয়া উত্তরে যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে কেবল কেল্লা আর 'ট্রেঞ্চ্'। তার মাঝ থেকে ভীষণ-দর্শন কতকগুলো পদার্থ মাথা তুলিয়া আছে যেন বাঘ ও চিতার দল লাফ দিবার জন্য উদ্যত—সেগুলো অতিকায় কামান। এখানে ওখানে সর্ব্বত্র কুয়াসার মাঝ দিয়া অস্পষ্ট

দেখা যাইতেছে আট দশ থাক করিয়া তার—সেগুলি তারের বেড়া। মাঝে মাঝে শত্রুর সন্ধানী চরের থানা। বিশ ত্রিশ জনের এক একটি দল তারের বেড়া বসাইতেছে। এই রঙ্গমঞ্চের উপরই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় হইবে—এখানেই জগতের দৃষ্টি পড়িয়া আছে। আমরা যাহারা এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিব, আমরা ত ইহার কথা ঘুমের মাঝেও ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

সেদিন থেকে আমরা লাংতুর কাছে থাকিয়া কাস্তাসান্ গিরিশিরে সুদৃঢ় বাধা তুলিতে লাগিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য, শত্রুর ডান দিকের মুখোমুখি তাকুযান্ ও সিয়াওকুযান্ পাহাড় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দখল করা; তারপর উক্ত পাহাড় দুটিকে আমাদের আক্রমণের বুনিয়াদ করিয়া শত্রুর আসল আত্মরক্ষার বেড়ার ( main line of defence ) উপর আক্রমণ সুরু করা।

১৯

## তাকুযান্ দখল

পোর্ট-আর্থার কেল্লার পূর্ব্বদিকে বেলাভূমির উপরে সমুচ্চ বন্ধুর পর্ব্বত, তার পার্শ্বদেশ প্রায় খাড়া উঠিয়াছে, ঝুঁকিয়া-পড়া পাথরে আর ফাটলে এখানে-ওখানে বেঁটে গাছের মেলা। দূর থেকে সমস্তটা দেখিলে মনে হয় যেন এক প্রাচীন বাঘ পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে। সেটি তাকুযান্ বা বড় 'অনাথ'; সিয়াওকুযান্ বা ছোট 'অনাথ' দক্ষিণে অবস্থিত, লাওলুৎসুই কেল্লার নিকটে এবং তার মুখোমুখি তাকুযান্-শৃঙ্গ একক, তার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশ পোর্ট-আর্থারের কেল্লার দিকে

নামিয়াছে, তার উত্তর-পশ্চিম পাশ আমাদের বামের ও মাঝের অবরোধক সৈন্যশ্রেণীর উপরে রহিয়াছে। আমাদের অবরোধের ব্যবস্থা, প্রত্যেক দলের চলাফেরা, গোলন্দাজের সংস্থান সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ের যে-পাশ আমাদের সামনে তা বিশেষ রকম খাড়া; তার উপর চড়া প্রায় অসম্ভব—কেন্‌জান্‌ ও তাইপোসানের মতই দুরারোহ। পাহাড়-দুটি থেকে শত্রু যেমন আমাদের লক্ষ্য করিতে পারিত, তারাও তেমনি আমাদের কামানের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের সম্বন্ধে আমাদের 'ডিভিসনের' নায়ক বলিতেন—ওই পাহাড়-দুটির সঙ্গে মুর্গির পাঁজরের মাঝের মাংসের তুলনা করা যেতে পারে। আয়ত্ত করা কঠিন, অথচ ছাড়তেও মন সরে না। ওই দুই পাহাড় যতক্ষণ শত্রুর হাতে থাকবে ততক্ষণ তারা ওপর থেকে আমাদের ওপর তোপ দাগবে, আবার আমরা যখন পাহাড়-দুটো দখল করবো তখনো শত্রুর কামানের লক্ষ্য না হয়ে উপায় থাকবে না।

স্বভাবতই যে-স্থান এমন সুরক্ষিত তা দখল করা অতি কঠিন, দখলে রাখা ততোধিক। অবর্ণনীয় সংগ্রামের পর যদিই বা নেওয়া যায়, তখন আশপাশের কেল্লা থেকে গোলার ঘায়ে অস্থির হইতে হইবে। প্রয়োজনের খাতিরে, ওই জায়গা দখল করাই চাই, নায়কেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেও, আমরা একটি গোলাও না ছুড়িয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম—শত্রু যদিও অবিরাম তোপ দাগিতেছিল। দুর্ভেদ্য অবরোধের আয়োজন শেষ করার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

শেষ পর্য্যন্ত সাতই আগষ্ট আক্রমণের দিন ধার্য্য হইল। ইহারই মধ্যে খুব গোপনে রকমারি কামান যথাস্থানে বসানো হইয়াছে। বেলা চারিটার সময় সমস্ত কামান একত্রে গোলাবর্ষণ সুরু করিল দুই পাহাড়ের শীর্ষরেখা লক্ষ্য করিয়া।

কামানের গুরুগর্জ্জনে শূন্য যেন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল, সাদা ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ অদৃশ্য হইল। কেবল ওই দুই পাহাড়ের কেল্লা থেকে নয়, পিছনের পান্‌লুং, চিকুয়ান্‌, লাগ্‌লুংস্থই পাহাড়ের কেল্লা থেকেও তখনি আমাদের তোপের জবাব সুরু হইয়া গেল। যতদূর দেখা যায় সমস্তই ধোঁয়ার ঢাকা, অন্ধকার আসন্ন-বর্ষণ আকাশ ভেদ করিয়া শত শত বজ্রের ভীষণ আওয়াজ যুগপৎ ছুটিতে লাগিল। আমাদের গোলা তাকুসানের শিলাময় দেহে আঘাত হানে, আর অমনি হরিদ্রাভ সাদা আগুনের ফিন্‌কি আর ছিন্নভিন্ন পাথর দূরে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। শত্রুর কামান আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, তা ছাড়া শত্রু আমাদের উঁপরে রহিয়াছে—সে-সুবিধা ত আছেই। আমাদের গোলন্দাজেরা নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে লড়িতে লাগিল, তাদের ক্ষতিও হইল বিস্তর; কিন্তু আমাদের বড় কামান সমস্তই উপত্যকার মাঝে আছে—মনে হইল শত্রুর গোলন্দাজেরা তাহা জানে না; তাই তারা আমাদের সৈন্যশ্রেণীর সঙ্গের কামানের উপর এবং আমাদের পদাতিকের উপরই তোপ দাগিতে লাগিল। ফলে, আমাদের বড় কামানের কোনো ক্ষতিই হইল না, সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে শত্রুর উপর তাদের প্রভাব অনেকটা বোঝা গেল—তাকু-যানের উপর রুশেদের কামান প্রায় নীরব হইয়া আসিল।

বেলা চারিটার সময় আমাদের রেজিমেণ্ট যাত্রা সুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কামান পথ খোলসা করিলেই তারা তাকু-নদী পার হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবে।

এই ভয়ানক যুদ্ধ বর্ণনা করার আগে, যুদ্ধের ঠিক আগে আমি কি ভাবিয়াছিলাম ও করিয়াছিলাম তাহাই বলিব। এই অভিজ্ঞতা কেবল আমার নয়—কঠিন যুদ্ধের আগে প্রায় সকল সৈনিকেরই এমনি হইয়া

থাকে। সৈনিকের যে-সব দুর্ব্বলতা থাকে, তার মধ্যে একটি ইহার দ্বারা বোঝা যায়। আমি অতি নগণ্য ও তুচ্ছ ব্যক্তি, তবুও লিয়াও-তুঙের মাটিতে পা দিবার পর গত তিন মাস যাবৎ রেজিমেণ্টের পতাকা বহন করিয়া আসিতেছি—যে-পতাকা স্বয়ং সম্রাটের প্রতীক। কেন্‌জান্, তাইপোষান্ ও কান্তোষান্—এই তিন যুদ্ধ পার হইয়া আসিয়াছি। সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, এ পর্য্যন্ত গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। অথচ সেই পতাকার তলে অনেক সাহসী যোদ্ধা মারা পড়িয়াছে, পতাকাটিও শত্রুর গোলার ঘায়ে ছিঁড়িয়াছে। উক্ত ঘটনার সময় আমার খুব কাছে এক সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল, সে মারা পড়িল, কিন্তু আমি অক্ষত রহিলাম। সে যাই হোক, আমার মৃত্যুর গুজব বার-বার দেশে রটনা হয়, সংবাদপত্রে আমার আহত হওয়ার মিথ্যা খবরও বাহির হয়। এ সব যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সময়ই শুনিতে পাই। একটা গুজব রটিয়াছিল যে, জাহাজ থেকে নামার সময় বিষম ঝড়ে আমার 'সাম্‌পান্'* উল্টাইয়া যায় এবং সমুদ্রের ঢেউ আমাকে গ্রাস করে! তবে মরার আগে আমি না-কি অনেকক্ষণ নিশান কামড়াইয়া ধরিয়া সাঁতার দিয়াছিলাম! আর একবার রটনা হয় যে, আমি জাহাজ থেকে নামিয়াই শত্রুর মুখে পড়িয়া আমাদের প্রথম দলের কাপ্তেনের সঙ্গে মারা পড়ি! এই সব ভুল খবরের কল্যাণে আমি ইতিমধ্যে 'বীর' আখ্যা লাভ করিয়াছিলাম; তারপর প্রায়ই আমার আহত হওয়ার সংবাদ বাহির হইতে লাগিল এবং প্রতিবারই সে-ঘটনার পরমাশ্চর্য্য খুঁটিনাটি বর্ণনা প্রকাশিত হইল! কিন্তু নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম আমি গুণলেশহীন এবং আমার দেহে একটা তুচ্ছ আঘাতও নাই! লজ্জিত না হইয়া

* চীনা নৌকা।

কি করি, মনে হইল আমার উপর বন্ধুবান্ধবের অনেক আশা, আমি একেবারেই তার অযোগ্য। এই চিন্তা আমার শান্তি হরণ করিল। মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম এই তাকুসানের যুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িয়া প্রাণত্যাগ করিব। আক্রমণ সুরু হইবার দিনকয় আগে ভৃত্যকে বলিলাম, ঠিক করেছি এবার মরবই! তোমার সেবা ও স্নেহের জন্য কেমন করে' ধন্যবাদ দেব জানি না—আমার এই মৃত্যুপণকেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলে' গ্রহণ করো! তাহাকেও সবিক্রমে লড়িতে অনুরোধ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া বেচারার চোখে জল আসিল, সে বলিল, আপনার যে-পথ আমারও সেই পথ!

তাহাকে বলিলাম, আমার ভস্মাবশেষের জন্য একটি কৌটা তৈরি করিব; তবে যদি এমন সুন্দর মৃত্যু হয় যাহাতে অস্থির চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকে, তবে সে যেন বাড়িতে আমার কিছু চুল আর কয়েকটা নখ পাঠাইয়া দেয়! তারপর, বড় গোলা প্যাক করার বাক্সের তক্তার টুকরা দিয়া এক কৌটা তৈরি করিলাম; আমার ভৃত্যের তৈরি বাঁশের পেরেক দিয়া তক্তাগুলা জোড়া হইল। ইঞ্চি তিনেক চৌকা একটা যেমন-তেমন কৌটা খাড়া করিয়া তার মধ্যে আমার একগোছা চুল, নখের টুকরা, আর দেহভস্ম মোড়ার কয়েকখানি কাগজ রাখিয়া দিলাম। কৌটার ঢাকার উপর আমার নাম এবং মৃত্যুত্তর বৌদ্ধ নামও লিখিলাম। 'কফিন' তৈরি হইয়া গেল, এবার কেবল প্রাণপণ চেষ্টায় মরিয়া সম্রাটের ও দেশের দয়ায় ঋণ পরিশোধ করিলেই হয়। বলা বাহুল্য, শেষ পর্য্যন্ত সে-কৌটা আমার ভস্মাবশেষ বহন করে নাই, এখন তাহা নিজের ও বন্ধুবর্গের পরিহাসের বস্তু হইয়া আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় তোকিয়োতে দাদার কাছে পত্র দিলাম। সম্প্রতি-কার যুদ্ধের খবর দিয়া লিখিলাম, পরদিন আমাদের আক্রমণ সুরু

হইবে। লিখিলাম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি—আমার দেহ পোর্ট-আর্থারে ধ্বংস হইলেও আমার আত্মা 'সাত জন্ম' রাজভক্তি ভুলিবে না'! চিঠিখানি আমার শেষ বিদায়-লিপিরূপেই পাঠাইয়াছিলাম। সেই দিনই আবার দাদার এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"মানের কথা বা গুণের কথা ভাবিয়ো না, কেবল আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাও।

"নেল্‌সন্ যখন ট্রাফালগারের যুদ্ধে মহান্ মৃত্যু বরণ করিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—Thank God I have done my duty !"

সাতই আগষ্ট বেলা পাঁচটায় কামানের গর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি মিলিত হইল। অপরাহ্ণ-আকাশ অন্ধকার নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তলায় তাকু নদী, উপরে উচ্চভূমিতে আমরা বসিয়া আছি—আগে চলার আদেশের অপেক্ষা করিতেছি। ক্রমে বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল, আকাশ আরও অন্ধকার হইল। শত্রুর সন্ধানী আলো পাহাড় ও উপত্যকার এক পাশে পড়িয়া শ্বেতাভ নীল আলো ছড়াইয়া আমাদের পদাতিকের চলায় বাধা দিতে লাগিল। শত্রুর তোপের বিক্রম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তোপের শব্দ বৃষ্টির শব্দে মিশিয়া একটা অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করিতেছে। একটা ওভারকোট দু'জনে মুড়ি দিয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট হায়াশি ও আমি মাঝে মাঝে কথা কহিতেছি।

হঠাৎ হায়াশি বলিল, যে কোনো মুহূর্ত্তে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে! মনে হইল সে তার মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে।

উত্তরে বলিলাম, আমিও আজ রাতে মরবই!

শুনিয়া হায়াশি বলিল, কতদিন একসঙ্গে আছি বলো ত!

বাক্যালাপ চালাইবার আর সুযোগ হইল না, আমাদের ছাড়াছাড়ি

হইল। দেশে বহুদিন দুজনে একই মেসে বাস করিয়াছি, যুদ্ধেও আমরা পরস্পরে সঙ্গী ছিলাম। এই হায়াশিই তাইপোযান্ আক্রমণের সময় সবার আগে তলোয়ার ঘুরাইয়া শত্রুর কেল্লায় প্রবেশ করে। এই আমাদের শেষ দেখা।

আগে বলিয়াছি, সন্ধ্যার দিকে আমাদের তোপের ফল ফলিতে সুরু হইল। তখন 'প্ল্যান্' অনুযায়ী আমাদের দল অগ্রসর হইতে সুরু করিল। বৃষ্টি বাড়িয়াই চলিয়াছে—তার আর বিরাম নাই; সরু পথগুলো ডোবায় পরিণত হইল। হাঁটুজল ও কাদা ভাঙিয়া বহুকষ্টে চলিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তাকুযানের উপর শত্রুর কামান অকর্ম্মণ্য বা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এখন বুঝিলাম সে ধারণা ভুল! যেই তারা দেখিতে পাইল ধোঁয়া ও বৃষ্টির মাঝ দিয়া 'মাচ' করিয়া চলিয়াছি অমনি আবার নূতন উদ্যমে তোপ দাগিতে সুরু করিল।

তাকু নদীতে পৌঁছিয়া দেখি ঘোলা জল কুল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, নদীর গভীরতা বুঝিবার উপায় নাই। প্রবল বৃষ্টির সুযোগে শত্রু কিছু-দূরে নীচে স্রোতের মুখে বাঁধ তুলিয়া বন্যার সৃষ্টি করিয়া আমাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতই সাহসী হই রুশেদের এই অপ্রত্যাশিত মিত্রকে তুচ্ছ করিতে পারিলাম না। তাহা করিলে শত্রুর তোপের মুখে না মরিয়া হয়ত কেবল জলে ডুবিয়া মরিব যে! দেখিতে দেখিতে আমাদের একদল বেপরোয়া ইঞ্জিনীয়ার অন্ধকার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বাঁধ ভাঙিয়া দিল, তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জল নামিয়া গেল। তখন পদাতিক দল জল ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এবার তারা ডুবিল না বটে, কিন্তু অনেকেই জলের মধ্যে শত্রুর গোলার ঘায়ে মরিল—তাদের মৃতদেহ এমন জড়ামড়ি করিয়া পড়িল যে নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত প্রায় যেন সেতু গড়িয়া উঠিল।

অবশেষে আমরা তাকুষানের তলায় গিয়া পৌঁছিলাম। এবার তারের কাঁটা-বেড়া ভাঙার পালা, সেই সঙ্গে 'মাইন্' মাড়াইবার আশঙ্কা। এক বিপদ শেষ হয় ত অন্য বিপদ আসে। কিন্তু এখন ইতস্তত করিবার সময় নয়—আমরা হাতে-পায়ে হামা দিয়া পাহাড়ে উঠিতে সুরু করিলাম। ঘন অন্ধকার ও প্রবল বৃষ্টি আমাদের অসুবিধা বাড়াইয়া তুলিল। নদী পার হওয়ার সময় একচোট ভিজিয়াছি, তারপর এই বৃষ্টি—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়া সপসপ করিতেছে; তবুও রক্ত চলাচল করাইবার জন্য ইচ্ছামত পেশী চালনার উপায় নাই; তার উপর, যতই রুশেদের ট্রেঞ্চের কাছাকাছি আসিতেছি, ততই তারা আমাদের মাথার উপর গুলি চালাইতেছে; কখনো বা পাথর ও কাঠের চাঁই ফেলিতেছে—অগ্রসর হওয়ার বাধা পদে পদে। আমাদের কাছাকাছি একটা দল 'ট্রেঞ্চে'র নিকটে পৌঁছিয়াছে—পাহাড়ের গাঁয়ে প্রায় মাঝপথে 'ট্রেঞ্চ'গুলি ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে রচিত।

আমাদের দিকে পাহাড়ের পাশে পাথরের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল—শত্রুকে রাত্রিকালে অতর্কিতে আক্রমণ করা হইবে। ওদিকে শত্রু সন্ধানী আলো আর তারারাজির সাহায্যে আমাদের অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হইয়া উঠিল। ফলে নিশীথ আক্রমণ অসম্ভব মনে হওয়ায় সে-মতলব আমরা ত্যাগ করিলাম; প্রত্যূষে আক্রমণ করাই স্থির হইল। অতঃপর আমরা দুইদল পরস্পর এবং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—অবারিত বৃষ্টিধারা আমাদের উপর অবিরাম ঝরিতে লাগিল।

পূবের আকাশ ফরসা হইয়া আসিল, বৃষ্টি তখনো পড়িতেছে। তাকু নদীতে ইতস্তত সঙ্গীদের দেহ সংগ্রহ করা গেল না, নদীর পরপারে কোনো আরদালিও পৌঁছিতে পারিল না। শত্রুর ঠিক দৃষ্টির তলে

আছি, তবুও আরদালি পাঠাইবার কামাই নাই—তারা প্রত্যেকেই গুলির ঘায়ে পড়িতে লাগিল, একজনও বাদ গেল না। নিদারুণ নিষ্ফলতা! কারও কোনো প্রস্তাব নাই, জানি না কখন বা কি উপায়ে শত্রুর উপর হানা দেওয়া সম্ভব। সেই সময় সার্জেন্ট-মেজর ঈনো তাকুযানের তলায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন। তাঁর পেটে গুলি বিঁধিয়াছে। যে-কেহ তাঁর পাশ দিয়া যাইতেছে তাহার কাছেই অনুনয় করিতেছেন—আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল—যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

ওদিকে রুশেদের এগারখানি জাহাজ য়েন্চ্যাঙের কাছে বাহির হইয়া আমাদের পদাতিক দলের পিছনে তোপ দাগিতে লাগিল। আমাদের কোনো আড়ালই নাই—শত্রুর অগ্নিবাণের আমরা নিশ্চিন্ত লক্ষ্য হইয়া উঠিলাম। তারা যথেচ্ছ আমাদিগকে মারিতে লাগিল। আমাদের আর আশা নাই—সামনের ফটকে বাঘকে আটকাইতেছি এমন সময় পিছনের ফটকে নেকড়ের হানা!

২০

## গিরি-শিরে সূর্য্য-পতাকা

বারুদের ধোঁয়া তরঙ্গভঙ্গের মত সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে; কালো বৃষ্টিধারা যেন ক্রুদ্ধ কেশরীদল। মাথার উপরে খাড়া পাহাড় আকাশ চুম্বন করিতেছে—তার উপর চড়া বাঁদরের পক্ষেও কষ্টকর। উপরপানে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পাহাড়ের চড়াই ক্রমে দুরারোহ হইতেছে—এক চড়াইয়ের অন্তে দ্বিতীয় চড়াইয়ের সুরু; তাহা আরোহণ করা আরও কষ্টকর। সেই উচ্চতা থেকে ভয়ঙ্কর 'রুশ ঈগল' বিপদের

সূচনা করিতেছে। সকল দিক থেকে আমাদের অগ্নিবর্ষণ শত্রুর ঘাঁটি তাকুসানের উপর কেন্দ্রীভূত। এই আক্রমণের জবাব দিবার জন্য সম্মুখে রুশেদের বড় কামানগুলো রক্তজিহ্বা মেলিতেছে, আর পিছনে আসিতেছে তাদের রণতরী আমাদের পিঠ চূর্ণ করার জন্য। শত্রুর সুবিধা অনেক, আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও প্রবল, তাদের পরাজিত করা সহজ নয়। কিন্তু এ জায়গা দখল করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত সেনার গতি রুদ্ধ হইবে, পোর্ট-আর্থারের কেল্লা আক্রমণ সম্ভব হইবে না, পোর্ট-আর্থার অবরোধের ভিত গাড়া যাইবে না। তাই যতই কঠিন হোক এবং যত ক্ষতিই হোক শত্রুকে সেখান থেকে হটানো চাই।

প্রবল বারি ও গোলা বর্ষণের তলে পাহাড়ের ধারে আমাদের দল সেই রাত ও পরদিনের সকাল কাটাইল। বিকাল তিনটায় আক্রমণের সুযোগ আসিল। আমাদের গোলন্দাজেরা শত্রুর জাহাজকে কিছুকালের জন্য পিছু হটিতে বাধ্য করায় সুবিধা হইল। নায়কের আদেশ পাওয়া মাত্র দুই ধারের দলই এক সঙ্গে যাত্রা সুরু করিল। খাড়া পাহাড়, প্রচণ্ড গোলাগুলি, বিরূপ প্রকৃতি—সমস্তই উপেক্ষা করিয়া দেবতার মত অবিচলিত শক্তি ও সাহসে সকলে উপরে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সৈনিকের চীৎকার ও হুঙ্কার, কামানের গুরুগর্জ্জন, কিরিচ ও তলোয়ারের ঝিলিক, উড়ন্ত ধূলা, রক্তের প্রবাহ, চূর্ণ অস্ত্র ও মস্তিষ্ক—লণ্ডভণ্ড ব্যাপার ভীষণ হাতাহাতি লড়াই। শত্রু উপর থেকে প্রকাণ্ড পাথর গড়াইয়া ফেলিতেছে, তার ঘায়ে অনেক হতভাগ্য গভীর উপত্যকার মাঝে গিয়া পড়িতেছে, অনেকে পাহাড়ের গায়ে গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। চিকুয়ান্-যান ও এরলুংযানের বড় কামানের লক্ষ্য ভাল—গোলাগুলো ঠিক তাকুযানের চূড়ায় ফাটিতে লাগিল। বৃত্তাকার ও অন্যবিধ গোলার

আগুনের বোঝা উজ্জ্বল আলোর সুদীর্ঘ রেখায় সকল দিক থেকে আনাগোনা ও কাটাকাটি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল 'বান্‌জাই' ধ্বনি যুগপৎ গিরিমূল ও শীর্ষদেশ থেকে উঠিয়া পাহাড় কাঁপাইয়া দিল। এ কি ? কি হইল ? ঐ না ধোঁয়ার মেঘের মাঝে সূর্য্য-পতাকা উড়িতেছে ? আমাদের আক্রমণ সফল হইয়াছে ! দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ভস্মবর্ণ ধোঁয়ায় মোড়া তাকুয়ান এখন আমাদের দখলে। কিন্তু সেই ব্যাপার ঘটিবামাত্রই শত্রুর সকল কেল্লা পাহাড়ের উপর আমাদের প্রধান আস্তানা লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে সুরু করিল। বড় কামানের গোলাগুলো, আকারে সাধারণ জলের কুঁজার মত, বাতাস কাঁপাইয়া ইঞ্জিনের মত হুসহুস করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বিকট শব্দে ফাটার সময়, সাদা ধোঁয়া যেখানে উঠিতেছে সেখানে একটা অদ্ভুত আলো ঝকমক করিতেছে, আর যেখানে অন্ধকার মেঘ ঝুঁকিয়া আছে সেখানে পাহাড় চূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড যেন নড়বড়ে হইয়া উঠিল, মৃত সৈনিকের দেহগুলা টুকরা টুকরা হইয়া গেল। আমাদের অবস্থা নিরাপদ ত নহেই, বরং বিশেষ সঙ্কটাপন্ন। জায়গাটা যারা দখল করিয়াছে আমাদের সেই সৈন্যদলের স্বস্থানে টিকিয়া থাকা দায়। শত্রু যদি আবার ফিরে-ফিরতি আক্রমণ করে—এবং তা সে করিবেই—তাহা হইলে এই বিপদসঙ্কুল গিরিশীর্ষে তাহাকে ঠেকানো যাইবে কি উপায়ে ? ঢালুর ওপারে শত্রুর ঘাঁটি দেখিবার জন্য একটু গলা বাড়াইলেই তাদের গুলি চলিতে থাকে—এক পা নড়িবার জো নাই। পাহাড়ের মাথায় শত্রুর ছয়টা কামান আমাদের হাতে পড়িয়াছিল, একজন সৈনিক সেগুলোর পাহারায় মোতায়েন ছিল, একটা গোটা গোলা আসিয়া বেচারাকে আঘাত করিয়া

একেবারে ছাতু বানাইয়া দিল। তার এক টুকরা মাংস আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া আমাদের পিছনে এক পাথরের উপর আঁটিয়া বসিল—সেইটুকুই তার ধ্বংসাবশেষ। আর একটা গোলা একদল সৈনিকের মাঝে পড়ায় এক মিনিটে ছাব্বিশ জন লোক উবিয়া গেল; আর সেই গোলার ঘায়ে চূর্ণ পাথরের তলায় তিন জন সৈনিকের জীবন্ত সমাধি লাভ হইল।

সেইদিন লেফটেন্যাণ্ট কুনিওর পেটে গুলি বিঁধিল। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল, তার ভৃত্য ও অন্য কয়েকজন তার সেবায় নিরত এমন সময় তার দাদা কাপ্তেন সেগাওয়া আসিয়া উপস্থিত। ভাই যে আহত, তার যে মৃত্যু আসন্ন—সে কিছুই জানে না। তাহাকে দেখিয়া সকলে বলিল, তোমার ভাই যে যেতে বসেছে! যাও, যাও, তার মুখে শেষবারকার মত একটু জল দিয়ে এস! কাপ্তেন তাড়াতাড়ি ভাইয়ের কাছে গিয়া হাঁকিল, কুনিও!

কুনিওর তখন অন্তিম দশা—সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল, কিন্তু দাদার ডাক তার কানে পৌঁছিল; মনে হইল, সে যেন সেই ডাকটি শুনিবার আশায় এতক্ষণ মরিতে পারে নাই! ঘোলাটে দৃষ্টি মেলিয়া সে দাদার মুখের পানে চাহিল, হাত বাড়াইয়া তার হাত খানা ধরিল, কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়া কথা বার হইল না। শেষে কাপ্তেন বলিল, সাবাস কুনিও, সাবাস! কিছু কি বলবে ভাই? বলিয়া সে মরণাহত ভাইয়ের মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিল, তারপর নীচু হইয়া নিজের বোতল থেকে তার মুখে জল ঢালিয়া দিল।

কুনিও ঈষৎ একটু মাথা নাড়িল, তারপর বলিল, দাদা! দাদা! আর কিছু বলিতে পারিল না। দাদাকে হয়ত কত কথা বলার ছিল, কিন্তু মরণ তার অবসর দিল কই!

দুই সপ্তাহ পরে, ২৪ আগষ্ট তারিখের যুদ্ধে কাপ্তেন সেগাওয়া বিদেশী অনুজের কাছে যাত্রা করিল!

.

যে কেল্লার শ্রেণী জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে, তাকুষান্ তার চাবি। সেই তাকুষান্ হাতছাড়া হওয়ায় রুশেরা যে খুব ক্রুদ্ধ ও নিরাশ হইবে ইহা স্বাভাবিক। তাকুষান্ আবার দখল করার জন্য বার-বার তারা আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারেই বিতাড়িত হওয়ায় তাদের নৈরাশ্য বাড়িয়া গেল।

ঐ পাহাড় দখলের দিনকয় পরে, গিরিশীর্ষে স্থাপিত আমাদের এক শান্ত্রী একদিন প্রত্যুষে রুশ সন্ধানী চরের গুলিতে মারা পড়িল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাদের দল ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের মাথায় উঠিল। দেখিতে পাইল তাদের দশ পনেরো ফুট নীচেই জনকয় রুশ কর্মচারী প্রায় সত্তর জন সৈনিকের আগে আগে তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে উঠিয়া আসিতেছে। আর এক মুহূর্ত ইতস্তত না করিয়া শত্রুর দিকে বন্দুক ঘুরাইয়া জাপানীরা গুলি চালাইতে সুরু করিয়া দিল। এই অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনায় শত্রুদলের চমক লাগিল, ফিরিয়া তারা পলায়ন করিল—তাড়াতাড়িতে উলটিয়া পালটিয়া প্রায় গড়াইয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের দল এমন সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল—পলায়নপর শত্রুর দিকে অবিরাম গুলি চলিতে লাগিল। একজনকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইল না—পাহাড়ের গায়ে তাদের মৃতদেহ ছড়াইয়া রহিল মসীচিহ্নের মত।

রুশেদের প্রচণ্ড একগুঁয়েমি দেখিয়া অবাক হইয়া যাই। হয়ত তাহাদের কোনো জায়গা আক্রান্ত হইয়াছে এবং তার এক অংশ বেদখল হইয়াছে, তখন অপর অংশের সৈন্যদের সেখান থেকে হটিয়া

যাওয়া দরকার হইতে পারে—অন্যথায় হয় মৃত্যু, নয় বন্দীদশা প্রাপ্তি। এমন অবস্থায়ও তারা স্থান ত্যাগ না করিয়া সেইখানেই লাগিয়া থাকে—যতক্ষণ না তারা মারা পড়ে। সকলে মারা পড়িবার পর হয়ত একজনে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন সেই একজনই গুলি চালাইতে থাকে। কাছাকাছি হইলে বন্দুকে কিরিচ চড়াইয়া সে লড়িতে থাকে যতক্ষণ না আত্মসমর্পণের চিন্তা তার মনে উদিত হয়। কেন্‌জান, তাইপোযান্‌, আর তাকুষানে এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত। শুনিয়াছি, নানশানের যুদ্ধের পরে, কোথা থেকে কেহ জানে না, গুলি ছুটিয়া আসিয়া আমাদের জন দশেক লোককে জখম ও নিহত করে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠিল, অনেক সন্ধানের পর দেখা গেল, রান্নাঘরে এক রুশ সৈনিক লুকাইয়া জানালা দিয়া নির্ভয়ে পরমাগ্রহে গুলি চালাইতেছে। রুশবন্দীকে যখনই এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তারা উত্তর দিয়াছে—নায়কের হুকুম অমান্য করিতে পারি না।

একজন মার্কিন সামরিক কর্ম্মচারী জাপানী সেনাদলের সঙ্গে কয়েকমাস মাঞ্চুরিয়ায় ছিলেন। তিনি বলেন, "জাপানী দলের মধ্যে, উঁচু থেকে নীচু পর্য্যন্ত সবার মধ্যে একটি সখ্যভাব ও একত্ববোধ বর্ত্তমান। তেমনটি আর কোনো জাতির সেনাদলের মধ্যে দেখা যায় না, এমন কি ইংলণ্ড বা গণতান্ত্রিক আমেরিকাতেও নয়। তাহাদের এই বিশেষত্ব মনকে আকর্ষণ করে।" কিন্তু রুশ সৈনিকের বিশেষত্ব যে একরোখা সাহস—তাও আমাদের প্রশংসার যোগ্য। পোর্ট-আর্থার আঁকড়াইয়া থাকার সময় তাদের গোলাগুলি রসদ ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব ঘটে, তার ফলে সৈনিকেরা হাজারে হাজারে মারা পড়ে—তাদের দুরবস্থা হয় ঝোড়ো হাওয়ার মুখে দীপশিখার

মত ; সেই নিরাশার মধ্যেও তারা অবিচলিত ছিল, শত্রুকে বাধা দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প এতটুকু শিথিল হয় নাই। রুশেদের সামরিক বিধিতে আছে—যুদ্ধে জয়মাল্য লাভ হয় কিরিচ ও রণহুঙ্কারের দ্বারা! গুলি ফুরাইয়া গেলে বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে শত্রুকে নিপাতিত করো! বন্দুকের বাঁট যদি ভাঙে তবে কামড়াইয়া দাও!

আক্রমণে ও বাধা দেওয়ায় তারা একরোখা, একথা খুব সত্য ; কিন্তু আবার নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তারা বিশেষ সতর্ক। রুশ চরিত্রের এই দুইটি বিশেষ লক্ষণ পরস্পর বিরোধী। "বরং ইটের টালি হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে তবুও মণি হইয়া ভাঙিবে না।"—মনে হইত ইহাই তাদের আদর্শ। জাপানী আদর্শ তার বিপরীত—সুন্দর মরণ বরণ করিয়ো, কিন্তু অসম্মানের জীবন চাহিয়ো না!

শুনিতে পাই এক বন্দী রুশ বলিয়াছিল—বাড়িতে আমার প্রেমিকা পত্নী আমার জন্য নিশ্চয়ই খুব ব্যাকুল হইয়া আছে। আমাদের নায়ক বলিতেন, জাপানী সেনা মাটির মূর্ত্তির মত ভঙ্গুর ; কিন্তু দেখিতেছি ঠিক তার উল্টো, তারা অসুরের মত শক্তিমান। যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে স্ত্রীর জন্য প্রাণটা রাখাই ভাল—আমি মারা পড়িলে শোকে সে পাগল হইয়া যাইবে। জাপানীকে আঁটিতে পারিব না। তাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও লড়িতে থাকা মূর্খতা নহে কি ?

শত্রুর আঘাতের মুখে তাকুযান্ রক্ষা করা ও আয়ত্তে রাখা খুব কঠিন হইলেও আমরা তাই করিলাম, শেষ পর্য্যন্ত রুশেরা রণে ক্ষান্ত দিয়া তাদের অধিকারভুক্ত স্থান দৃঢ়তর করার চেষ্টায় নিরত হইল, এবং বিভিন্ন কেল্লা থেকে বড় বড় কামান অবিরাম দাগিয়া আমাদের কাজে বাধা দিতে লাগিল। তাকুযানের যে পাশ শত্রুর দিকে অবস্থিত সেই দিকটা

সুদৃঢ় করা ; অবরোধের মাল-মসলা সংগ্রহ, অতিকায় কামানের ভিত্তি রচনা, শত্রুর 'মাইন'এর খবর লওয়া, তাদের কাঁটাতারের বেড়ার অবস্থা ও আমাদের 'মার্চ' যে পথে হইবে তাহা কতটা শত্রুর তোপের অধীন তাহা নির্ণয় করার জন্য হুঁসিয়ার গুপ্তচর নিয়োগ—এইরূপে আমরা ভাবী যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলাম। সমস্ত ব্যবস্থা ও সন্ধান সম্পূর্ণ হইলে ১৯ আগষ্ট প্রথম আক্রমণের দিন ধার্য্য হইল। আমাদের দলের প্রধান লক্ষ্য পূর্ব্ব-চিকুয়ান্সান্।

২১

## পদোন্নতি ও বিদায়

সম্রাটের ঘোড়ার ক্ষুরের তলায় ধূলায় পরিণত হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমরা জাপান ছাড়িয়াছিলাম সত্য ; বলিয়াছিলাম—মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া এখানে দাঁড়াইলাম! হৃদয় অধীর, কিন্তু সুযোগ আসিতেছে মন্দগতি! যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রার সুরু থেকে শতাবধি দিন কাটিয়া গেল। তখন দেশের মাঠে ও পাহাড়ে কত ফুল মধুর গন্ধে আমাদের পোষাক সুরভিত করিয়াছিল, মলয় বাতাস সন্তর্পণে সূর্য্য-পতাকাকে চুমা দিয়া অজানা দূরদেশে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল! সময় কত শীঘ্র চলিয়া যায়—এখন আমরা সবুজ পাতার ছায়ে বসিয়া আছি। রাতে বাহুর উপর মাথা দিয়া যখন ঘুমাইয়াছি, দিনে গুলি-বৃষ্টির মাঝে যখন ঘুরিয়াছি, মরিয়া সম্রাটের দয়ার ঋণ শুধিবার ইচ্ছা কখনই মন হইতে সরিয়া যায় নাই। শেষ যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উপভোগ না করিয়াই আমাদের হাজার হাজার সঙ্গী মারা পড়িল, তাদের অশান্ত

আত্মা এখনো বিরাম পাইল না। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আমরা উৎসুক কিন্তু সুযোগ আসে কই? আমরা যারা বাঁচিয়া আছি, আমরা গলিত মাংস ও ঘুণধরা অস্থির দুর্গন্ধের মাঝে বাস করিতেছি। আমাদের দেহের মাংসও শুকাইয়াছে, অস্থি শীর্ণ হইয়াছে। আমরা যেন একদল আত্মা, শীর্ণ ভঙ্গুর দেহে তীব্র অধীর আকাঙ্ক্ষা বহিয়া ফিরিতেছি, অথচ আমরা য়ামাতোর * আসল চেরিগাছেরই শাখা প্রশাখা। কি করিয়া এখনো বাঁচিয়া আছি, একটা দুটো নয়, চার চারটে যুদ্ধ লড়িয়া? কেন এখনো মনোরম চেরির পাপড়ির মত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িলাম না? তাকুবানের উপর মরিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আমার কত সঙ্গী আমাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আমার মরা হইল কই? এবার নিশ্চয়ই জন্মভূমিকে আমার নগণ্য দেহ নিবেদন করার সম্মান লাভ করিতে পারিব! এই ধারণা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলাম।

আগষ্ট মাসের প্রথমেই পদোন্নতি হয়, কিন্তু প্রথম-লেফ্‌টেন্যাণ্ট হওয়ার খবরটা এখন আসিল। কর্নেল আওকি আমাকে ডাকিয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমার পদোন্নতিতে অভিনন্দন করি! গোড়া থেকেই তুমি পতাকা বহন করেছ, সে-কাজ থেকে এবার তোমার অব্যাহতি। অতঃপর আরও তৎপর হওয়া চাই—কাল সম্মিলিত আক্রমণের দিন। অনেক দিন একত্রে আহার নিদ্রা সম্পন্ন হয়েছে, আজ বিদায় নিতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তবুও বলি, নমস্কার! তোমার চেষ্টা সার্থক হোক!

তাই বটে। এদেশে আসার পর থেকেই নায়কের সঙ্গে খাইয়াছি শুইয়াছি, তাঁর পাশে পাশে থাকিয়া লড়িয়াছি। বৃষ্টি ও হিম মাথায়

---

* জাপানের।

করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় থাকার সময় কর্নেল তাঁর শয্যার ভাগ দিয়াছেন পাছে আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। আহার্য্য পর্য্যাপ্ত নয়, তবুও তাহা আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইয়াছেন—মুখে প্রসন্ন তৃপ্ত হাসি, যেন আপন গৃহে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে আহার সমাধা হইতেছে। বাড়িতে পালঙ্কে দিব্য আরামে শোওয়ার যাঁর অভ্যাস, খড়ের মাদুরে খড়ের বালিশ মাথায় দিয়া হয়ত অসুখে পড়িবেন বলিয়া ভয় হইত। তিন হাজার প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর জীবন মহামূল্য—তাঁর স্বাস্থ্যের উপর সমস্ত রেজিমেণ্টের উদ্যম ও উৎসাহ নির্ভর করে। সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছি, যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে যথাসম্ভব আরামে রাখার চেষ্টা করিয়াছি। কিছুকাল আগে চুংচিয়াতুনে থাকার সময় একটা জালায় জল গরম করিয়া তাঁকে স্নানের জন্য দিয়াছিলাম। তিনি ভারি খুশী হইয়াছিলেন—তখনকার তাঁর সেই আনন্দিত মুখ কখনো ভুলিব না। এখন সেই কর্নেলকে ছাড়িয়া যাওয়ার সময় দুঃখের আর অবধি রহিল না। এখনো অবশ্য তাঁরই অধীনে অন্য এক দলে থাকিব, এখনো আমি তাঁরই তাঁবেদার। এ প্রকৃত ছাড়াছাড়ি নয়, তবুও কিন্তু মনে হইল তাঁর কাছ থেকে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। তাঁর বিদায়বাণী শুনিয়া কান্নায় আমার গলা ধরিয়া আসিল, কিছুক্ষণ মাথা তুলিতে পারিলাম না। সম্পদে-বিপদে এতকাল যে-পতাকার পরিচর্য্যা করিয়া আসিলাম, সেই পতাকা ত্যাগ করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হইল। ছিন্নভিন্ন মলিন সেই পতাকা কর্নেলের বামে দুলিতেছে; তার পানে চাহিয়া মনে হইল, ঐ পতাকা দর্শনে তিন হাজার লোকের প্রাণে উত্তেজনার সঞ্চার হয় বটে, তবুও তার মধ্যে কেবল আমারই মনে সবার বেশি ভাবের সঞ্চার হওয়ার যেন একটা বিশেষ দাবি আছে।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কহিলাম—কর্নেল, লড়াই করে' আপনাকে

দেখাবো...! আর কিছু বলিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া কয়েক পা গিয়া ছুটিয়া আমার ভৃত্যের কাছে হাজির হইলাম। বলিলাম—হুকুম এসেছে, এবার আমায় যেতে হবে। কাজেই তোমাকেও আমার কাজ ছাড়তে হবে, কিন্তু তোমার দয়া আমি ভুলবো না। চিরদিন আমাকে বড় ভাই বলে' মনে রেখো আর নির্ভয়ে যুদ্ধ কোরো।

শুনিয়া আমার সৈনিক ভৃত্য তাকায়ো কাঁদিয়া অস্থির। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, তাকুযানের যুদ্ধের আগে দুজনে যে-কৌটাটি তৈরি করেছি, এবার নিশ্চয়ই সেটি কাজে লাগবে!

তাকায়ো কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি আমাকে ছোটভাইয়ের মত দেখেন?

পাছে নিজেও কাঁদিয়া ফেলি সেই ভয়ে আর জবাব দিতে পারিলাম না।

পতাকা ছাড়িয়া, কর্নেলকে ছাড়িয়া, অনুগত বিশ্বাসী ভৃত্যকে পিছনে ফেলিয়া নির্জ্জনতার মাঝ দিয়া একলা চলিয়াছি। এই-সব পাহাড় ও উপত্যকা এখন আমার স্নেহের সাথীদের সমাধিভূমি... আকাশে মেঘ আসাযাওয়া করিতেছে...ভাবিতে লাগিলাম, যা-কিছু পার্থিব তা কত নশ্বর! হঠাৎ মনে হইল আর একবার ডাক্তার য়্যাসুইয়ের সঙ্গে দেখা করি, আমার গ্রামের উপরিতন কর্ম্মচারী কাপ্তেন মাৎসুওকাকেও বিদায় নমস্কার করিয়া যাই। তখনি ফিরিলাম। তাকুযানের উত্তর পাদমূলে এক গিরিসঙ্কটে গিয়া পৌছিলাম। কাপ্তেন একাকী তাঁর তাঁবুর মধ্যে বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুশী হইলেন।

"কিছু কাল তোমায় দেখিনি। ভাল আছ বেশ?"

"ভালই আছি। ধন্যবাদ! আমার পদোন্নতি হয়েছে—প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট হয়েছি। আমার ওপর দয়া রাখবেন।"

কাপ্তেন হঠাৎ বলিলেন, তাহলে এ জগতে এই আমাদের শেষ দেখা!

আমি বলিলাম, আমিও মরবো বলে আশা করি। চিকুয়ান্‌সানের চূড়ায় একসঙ্গে মরতে পারলে বেশ হয়!

যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলে কাপ্তেন আমার কাঁধ থাবড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোমরবন্ধে ওটা কি?

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, আমার 'কফিন্‌'!

"বটে? তুমি তাহলে তৈরি হয়েই আছ!"

তারপর প্রথম ব্যাট্যালিয়নের সদরে হাজির হইলাম—চুাচয়াতুনের কাছে, পাহাড়ের আড়ালে। ডাক্তার য়্যাসুইয়ের সঙ্গে দেখা হইল। সেখানে পৌঁছানর অল্পক্ষণ পরেই তাঁবুর সামনে বিকট শব্দে কয়েকটি শত্রুর গোলা আসিয়া পড়িল। এ সব এখন সহিয়া গেছে। আমরা ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। শুনিলাম, এই জায়গাটিকে লক্ষ্য করিয়া শত্রু প্রায়ই তোপ দাগিয়া থাকে। ডাক্তার য়্যাসুইকে পদোন্নতির খবর দিলে তিনি আমাকে এক পাশে লইয়া গেলেন। দেখিলাম বারুদের বাক্সগুলো গাদা করা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমার দেখা পাইবার জন্য অধীর হইয়া ছিলেন। বলিলেন, এক জায়গায় থাকি তবু একটু নিরিবিলি গল্প করা ঘটিয়া ওঠে না। প্রতিদিন তিনি আমার চিঠির অপেক্ষা করিয়াছেন। শুনিয়া মন গলিয়া গেল। বলিলাম, আশ্চর্য্য যে আমরা দুজনে এখনো বাঁচিয়া আছি! কিন্তু এবার আর গোল নাই, মরিতেই হইবে—এবার শেষ বিদায় লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই আসিলাম। সেই হুয়াংনিচুয়ানের বাড়িতে দুজনে যে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, দুজনে মরিলে কথ নাই, কিন্তু যদি আমি আগে মরি, তবে সে আমার রক্তমাখা পোষাকে খানিকটা কাটিয়া লইয়া স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিবে! তারপর পরস্পরে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, এই শেষ! পরস্পরের সাফল্য কামন করিয়া চোখের জল ফেলিয়া বিদায় লইলাম।

অনিচ্ছায় পায়ে পায়ে তাঁবু থেকে বার হইয়া তাকু নদী পা হইলাম। তারপর শত্রুর কেল্লার মুখোমুখি পাহাড়ের ঢালু বাহিয় উঠিয়া ব্রিগেড্-সদরে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেলকে সেলাম দিবার জন গেলাম। ঠিক সেই সময় এক কর্ম্মচারী পীড়িত হইয়া ছুটি লইয়াছিলে আমাকে তাঁর জায়গায় একটিনি নিযুক্ত করা হইল। পরে আমি বারো নম্বর কম্পানির নায়কের পদ পাই।

আক্রমণের আগের রাতে পাচক দুখানা চিঠি আনিয়া দিল। এমন জায়গায় এই অবস্থায় চিঠির আশা করা যায় না—চিঠি দুখানা অনেক ঘুরিয়া আমার হাতে পৌঁছিয়াছে। দুই পত্রই দাদার লেখা—একখানার মধ্যে এক ফাউণ্টেন্ পেন্, অন্যখানার মধ্যে তিন ও চার বৎসর বয়সে দুই ভাইঝির ছবি। কচি কচি মিষ্টি মুখ—ছবির মাঝ থেকে যেন তার 'কাকা' বলিয়া ডাকিতেছে! ফটোর শিশুগুলি যদি দেখিতে পাইত তবে দেখিত কাকার মুখ এমন শীর্ণ যে আর চেনা যায় না—দেখিয় হয়ত কাঁদিয়া ফেলিত। দিনরাত কেবল অপরিচ্ছন্ন সৈনিক, ভাঙা হাড় আর ছিন্ন মাংস দেখিয়া আসিতেছি। তৃণভূমির উপর যে ফুলগুলি হাসিতে থাকিত তারাও এখন পায়ের চাপে সব মারা পড়িয়াছে। এমন নিষ্করুণ নীরস যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন যুদ্ধের আগের রাতে আমার স্নেহের দুই ভাইঝি আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিল—আমার অধীর অন্তরে কোমল হাত বুলাইয়া দিল—এ কী আনন্দ! তাদের সুন্দর চোখেমুখে

চুমা না দিয়া পারিলাম না। আপন মনে বলিতে লাগিলাম—তোদের সাহস ত কম নয়! মায়ের আদরের কোল ছেড়ে বিরাট বিস্তীর্ণ সাগর আর বিশাল ঢেউ অতিক্রম করে' আমাকে দেখতে এলি এই বারুদের মেঘ আর গোলাগুলির বৃষ্টির দেশে! তা বেশ করেছিস, কাকা কাল তোদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাবে কেমন ক'রে জাপানের শত্রুকে শাস্তি দিতে হয়!

আজ রাতের মত ধোঁয়ার মেঘ কাটিয়া গেছে, আকাশে উজ্জ্বল তারাদল হাসিতেছে। শিশু 'ভাইঝি-দুটিকে' পাশে নিয়া তাঁবুতে ঘুমাইলাম। নেল্‌শনের শেষ কথা মনে পড়িতে লাগিল। জাপান ছাড়ার সময় যে শ্লোক লিখিয়া বাবাকে দিয়া আসিয়াছিলাম, সেটি বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম—যুদ্ধে মৃত্যুর মহিমা...সাতজন্ম ব্যাপী রাজভক্তি! নির্জ্জন প্রান্তরে মাথার খুলি ফেলিয়া দেশভক্ত আত্মার সপ্ত জন্ম পরিগ্রহ কাল ঘটিবে, না তার পরদিন?

য়্যামামোতো নামে এক ল্যান্স-কর্পোর‍্যাল ছিল। সে এই সময় মা ও ভাইয়ের কাছে নখ ও চুলের টুকরা পাঠায়, তার সঙ্গে ছিল বিদায়-লিপি ও একটি কবিতা। সেই চিঠিই তার শেষ চিঠি। তাহাতে লেখা ছিল—

"ইতিমধ্যে দুই দুইবার দুঃসাহসী দলে যোগ দিলাম, তবুও মাথা এখনো কাঁধের উপর আছে। মৃত সঙ্গীদের কথা ভাবিলে দুঃখে মন ভরিয়া ওঠে। আমাদের দলের প্রায় দু-শ' লোকের মধ্যে কেবল কুড়িজন অক্ষত-দেহ আছে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, এই অল্প-সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। মানুষ বাঁচে আর কতদিন, জোর বছর পঞ্চাশ—যথাসময়ে সেই জীবন দিতে না পারিলে এর পর হয়ত সুযোগ

মিলিবে না। দু-দিন আগে নয় পরে সকলের মত আমাকেও মরিতে হইবে, তাই 'টালি হইয়া আস্ত থাকার চেয়ে মণি হইয়া গুঁড়া হওয়ার' বাসনা। গোলাগুলি কিরিচ যাই আসুক না কেন, মরিব কেবল একবার! ডানদিকে আমার সাথীর গায়ে গুলি বিঁধিল, বাঁদিকে আমার নায়কের উরু ও বাহু শূন্যে উড়িল, মধ্যে আমার গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিল না—স্বপ্ন কি না পরখ করার জন্য নিজের গায়ে চিমটি কাটিলাম। চিমটি লাগিল—তবে নিশ্চয়ই এখনো বাঁচিয়াই আছি! আমার মৃত্যুকাল এখনো আসে নাই—সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎপর হওয়া চাই। আমি নির্গুণ, কিন্তু হৃদয় আমার অধীর। কুঁড়েঘরে খড়ের চাটাইয়ের উপর স্বাভাবিক অতি তুচ্ছ মৃত্যুর বদলে যদি নির্ভয়ে লড়িয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিই, তবে চাষার ছেলে হইলেও লোকে আমার সঙ্গে চেরিফুলের তুলনা করিয়া গান গাহিবে!

বান্‌জাই, বান্‌জাই, বান্‌জাই!"

## ২২

## সমবেত আক্রমণের সুরু

শোনা যায় রুশ খবরের কাগজ Novoye Vremya-র সংবাদদাতা পোর্ট-আর্থার রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এ যেন ঈগলের বাসা—আকাশ-ছোঁয়া মইও তার কাছে পৌঁছিতে পারিবে না! তাই বটে। যতদূর চোখ যায়, ছোটবড় প্রত্যেক পাহাড়ে কেবল কেল্লা আর প্রাচীর (র‍্যাম্‌পার্ট), স্থলের দিকটা সুকঠিন লৌহ-প্রাচীর-বেষ্টিত। রুশ সৈন্যদলের বাছা বাছা সাহসী সৈনিক তার রক্ষক। সেই 'দুর্ভেদ্য'

দুর্গকে 'ভেস্ত' প্রমাণ করার জন্য আমরা এখন তার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছি।

তাকুষানের তলায় থাকার সময় আক্রমণের নানা আয়োজন চলিতে লাগিল। কাঁটা-তারের বাধার উপর শত্রুর খুব আস্থা—তাহা অতিক্রম করার উপায় আবিষ্কার করা দরকার। সেই বেড়ার তারে ও খুঁটিতে আগেকার যুদ্ধে আমাদের বহু সৈনিক মারা পড়িয়াছে। বড় ছোট উঁচু নীচু যত পাহাড় দেখিতেছি সর্ব্বত্রই এই সব ভয়ানক পদার্থ—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় জমির উপর কালো কালো ফোঁটা ছিটানো রহিয়াছে।

এই-সব বাধা ভাঙিয়া মাড়াইয়া যাইতে হইবে। আসলে তার-কাটার কাজ ইঞ্জিনিয়ারের, কিন্তু তাদের সংখ্যা পরিমিত, অথচ তারের বেড়ার শেষ নাই বলিলেও চলে, অগত্যা পদাতিক সৈন্যদলকে এই কাজ শিখিতে হইল। তাকু-নদীর তীরে এক নকল তারের বেড়া খাড়া করিয়া ঠিক সেটিকে কিরূপে ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শিখিতে লাগিলাম। প্রথমে একদল লোক বড় হাতলের কাঁচি হাতে অগ্রসর হইয়া লোহার তার কাটিয়া ফেলিবে, তারপর করাতধারীরা গিয়া খোঁটাগুলো ভূমিসাৎ করিবে অথবা করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিবে, এইরূপে তারের বেড়ায় খানিকটা ফাঁক হইলেই তার মাঝ দিয়া একদল লোক ছুটিয়া ঢুকিয়া যাইবে।

কাজটি বিশেষ জরুরী, তাই অধ্যবসায় ও উৎসাহের সঙ্গে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আসল লড়াইয়ে কিন্তু এত সহজে কাজ সম্পন্ন হয় না। তারের বাধা ধ্বংস করিতে যারা অগ্রসর হয়, তারা প্রায় সকলেই মারা পড়ে, কারণ 'মেশিন্-গানের' মুখের কাছে দাঁড়াইয়া তাদের কাজ করিতে হয়। তার উপর দেখা গেল তারগুলোতে

তড়িৎ-প্রবাহ আছে। যদিও উক্ত তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে দুইটা মত ছিল—কেহ বলিত, প্রবাহ এত প্রবল যে, তার ছুঁইলেই মৃত্যু হয়; আর কেহ বলিত, প্রবাহ দুর্ব্বল; উহার উদ্দেশ্য, তার যারা ধ্বংস করিতে আসিবে তাদের আগমন শত্রুর মিনারে জানাইয়া দেওয়া। সে যাই হোক, বিদ্যুৎ-প্রবাহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সাধারণ কাঁচি দিয়া তার কাটার উপায় নাই, তাই আমরা কাঁচির হাতলে বাঁশের ছড়ি বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম। এসব সাবধানতা সত্ত্বেও আসল লড়াইয়ের সময় দেখা গেল তারে প্রবল প্রবাহ বর্ত্তমান, তার ফলে আমাদের কতক লোক নিমেষে মারা পড়িল, কারও কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁখারির মত কাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। মইয়ের সাহায্যে শত্রুর খাত পার হওয়ার অভ্যাসও চলিতে লাগিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল খাতগুলি এত চওড়া বা গভীর যে, মইগুলি বিশেষ কোনো কাজে লাগিল না।

সর্ব্বত্র মাটিতে পোঁতা 'মাইন্'। ইঞ্জিনিয়ারেরা পলিতা কাটিয়া দিয়া সেগুলো নষ্ট করিল। আক্রমণের দিন পর্য্যন্ত দূরবীন্ দিয়া দেখিতে লাগিলাম রুশেরা ইতস্তত এই সব বিস্ফোরক মাটিতে পুঁতিতেছে। আমাদের ম্যাপে সেই সব জায়গা চিহ্নিত করিলাম। সন্ধান লইয়া যতটা সম্ভব সমস্তই মনে করিয়া রাখিলাম। যেমন, তারের বেড়ার প্রত্যেক খুঁটি হাতুড়ির বারো ঘায়ে বসানো হইয়াছে; অমুক উপত্যকায় এতগুলি 'মাইন' পোঁতা হইয়াছে! আমাদের সন্ধানী দল জানিতে পারিল যে, যে-সব গিরিসঙ্কট দিয়া আমাদের সেনাদলের উপরে ওঠার সম্ভাবনা, তার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রচুর চতুরতার সহিত 'মাইন্' বসানো হইয়াছে। যেমন ধরুন গিরিসঙ্কট যেখানে খুব সরু, সেখানে এমন একটি 'মাইন্' পোঁতা আছে যার উপর পা দিলেই ফাটিয়া

যাইবে। প্রথম লোকটি মারা পড়িলে স্বভাবতই বাকি লোক গিরি-সঙ্কটের দুই পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে, অমনি সেখানকার শ্রেণীবদ্ধ 'মাইন্' সমস্ত দলটাকেই শেষ করিয়া দিবে। এই সব জায়গা দিয়া নিরাপদে যাওয়া ভারি শক্ত। তার উপর সমস্ত কেল্লা ও গুপ্ত খাতের (ট্রেঞ্চ) কামান ও বন্দুক এমন ভাবে স্থাপিত যে, প্রত্যেক গিরিসঙ্কট ও পাহাড়কে লক্ষ্য করিয়া গোলাগুলি দাগা চলে। তিন দিকের গোলাগুলি থেকে কারও পরিত্রাণের উপায় নাই। শত্রুর আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় ত্রুটি নাই বলিলেও হয়।

১৯এ আগষ্ট তারিখের প্রত্যূষে আমাদের সমস্ত গোলন্দাজেরা একযোগে গোলা দাগিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব-চিকুয়ান্যান্ যদিও প্রধান লক্ষ্যস্থল, তবুও অন্যান্য কেল্লা বাদ গেল না। অচিরে আক্রমণ-কারীরা তোপের আড়ালে শত্রুর দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। রুশেদের উপর যেই তোপের ফল ফলিতে সুরু করিবে অমনি সকলে হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িবে। তাই আমাদের গোলন্দাজেরা সমস্ত শক্তি দিয়া কেল্লা ভাঙার, বোমা-নিবারক আড়াল চূর্ণ করার এবং গুপ্ত খাতের মাঝ দিয়া পথ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই পথ দিয়া আমাদের দল প্রবেশ করিবে।

আমাদের দিক থেকে গোলা চলা সুরু হইতে-না-হইতে শত্রুর সকল কামানের সারি জবাব দিতে লাগিল। উদ্দেশ্য, আমাদের কামানের মুখ বন্ধ করিয়া পদাতিক দলকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া। দু-দিকের অতিকায় কামান থেকে যখন বড় বড় গোলার লেনদেন চলিতে লাগিল, তখন সে কী দৃশ্য! পিপের মত বড় বড় বিস্ফোরক 'শেল্' আর গোলাকার 'শেল্' শূন্যে বিষম কাঁপনের সৃষ্টি করিল, তাদের গোঙানির ঘাত-প্রতিঘাত বাজের হুহুঙ্কারকে আমলেই আনিল না। 'শেল' ফাটিয়া

সর্ব্বত্র তড়িৎ বৃষ্টি করিতে লাগিল, ধোঁয়া দিগ্বিদিক বাষ্পঘন মেঘে ঢাকিয়া দিল, মনে হইল তার মধ্যে কোনো জীবেরই নিশ্বাস লওয়া অসম্ভব। শত্রুর 'শেল্'-এর নাম দিয়াছিলাম 'ট্রেন্-শেল্,' কারণ সেগুলো গুম্‌গুম শব্দের সঙ্গে তীক্ষ্ণ চীৎকার করিতে করিতে আসিত—যেন তীব্রসুরে বাঁশি বাজাইয়া ট্রেন ষ্টেশন ছাড়িতেছে। আমাদের কাছে যখন এমনি শব্দ পাইতাম তখন সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপিতে থাকিত, আর সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে মানুষ, ঘোড়া, পাথর ও বালি একযোগে উপরপানে ছিটকাইয়া উঠিত। এই সমস্ত 'ট্রেনের' সঙ্গে যার ধাক্কা লাগিত তাই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত; সেই টুকরাগুলা মাটিতে পড়িয়া আবার লাফাইয়া উঠিত যেন তাদের ওড়ার ডানা আছে। 'শেল্'-এর টুকরায় একজন লেফটেন্যাণ্টের গলা ছিঁড়িয়া কেবল চামড়ায় মুণ্ডটা ঝুলিতে লাগিল! এক সৈনিকের দু-দুটা হাত কাঁধ থেকে পরিষ্কার কাটিয়া উড়িয়া গেল।

গোলা চালাইয়াই সে দিনটা শেষ হইল। প্রথমে দু-একদিন তোপ দাগিয়া পরে পদাতিকের আক্রমণ হইবে ইহাই স্থির ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কার্য্যগতিকে আমাদের ডিভিসনের সদরে গেলাম—সেখানেই আমাদের গোলন্দাজেরা স্থাপিত হইয়াছিল। অন্ধকার রাত, আকাশের মাঝ দিয়া শ্বেতাভ নীল আগুনের দণ্ড যুদ্ধমান দুই দলের মাঝে ছুটাছুটি করিতেছে—মনে হইল সেটা যেন নরকে যাইবার প্রশস্ত পথ! চিকুয়ান্‌যান ও পাইইন্‌যান্ থেকে রুশেদের সন্ধানী আলো আমাদের গোলন্দাজের আড্ডার উপর পড়িতেছে। ভীতিপ্রদ সেই আলো ঘনঘন আমাদের পায়ে পায়ে অগ্রগামী পদাতিকদলের দিকে ফিরিতেছে। শত্রুর যে-সব সন্ধানী আলো কাড়িয়া লইয়াছিলাম তাহার দ্বারা রুশেদের আলোর শক্তি প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলাম, সেই আলোয় রুশেদের কামানগুলোও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু শত্রুর কাছে এখনো যেগুলো আছে তার শক্তি আমাদের সন্ধানী আলোর চেয়ে ঢের বেশি। মাঝে মাঝে শত্রু তারা-'শেল্' ছুড়িতেছে—মনে হইতেছে যেন শূন্যে বিজলী বাতি ঝুলিতেছে; চারিদিকে যেন দিনের আলো, তাহাতে একটি পিঁপড়ের চলাফেরাও দেখা যায়। সুতরাং আমাদের এতটুকু নড়াচড়াও শত্রুর দৃষ্টি এড়ায় না, অমনি আক্রমণেচ্ছু সেনাদলের উপর 'মেশিন্-গান্'-এর মারাত্মক গুলিবৃষ্টি সুরু হইয়া যায়। তাই আকাশে তারা-বাজি ফাটিতে দেখিলেই পরস্পরকে সাবধান করি—খবরদার! নোড়োনা, নোড়োনা!

'ডিভিসন্'-নায়কের সদরে পৌঁছিয়া দেখি দলবল-সহ তিনি গোল-ন্দাজদের কাছে দাঁড়াইয়া তিমিরাবরণ-মুক্ত রাতের লড়াইয়ের দৃশ্য দেখিতেছেন। রুশ-কেল্লায় সন্ধানী আলো দেখা দিলেই বলেন—লাগাও ওটাকে! দাও গুঁড়ো করে'! নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে হাতদুটো মুড়িয়া বলিতে থাকেন—নতুন ক'নের মত আমার অবস্থা! এত আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মারা যেতে বসেছি!

সেই রাতে আমাদের দল ইয়াংচিয়া-কউ পর্য্যন্ত হাঁটিল। সেখানে পৌঁছিবার কিছু পরেই বিকট শব্দে এক 'শেল্' আসিয়া পড়িল। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই কেউ মরেছে! কে তারা? কে? ধোঁয়া সরিলে দেখিলাম জন চার পাঁচ হতাহত পড়িয়া আছে, তাদের মধ্যে দু-জন নবাগত, মাত্র কয়েকদিন আগে দেশ হইতে আসিয়াছিল। দু-জনের ভয়াবহ মৃত্যু—কোমরের নীচে আধখানা দেহ উড়িয়া গেছে! অপরের দুই পা চূর্ণ হইয়াছে—হুহু করিয়া জলের মত রক্ত বার হইতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজনের গায়ে কেন গুলি লাগে, অথচ অপর জনের গায়ে লাগে না—এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এমন লোক আছে যে একটার

পর একটা ভয়ানক যুদ্ধে লড়িতেছে, কিন্তু গায়ে তার একটি আঁচড়ও লাগিতেছে না ; আবার এমন লোক আছে যে নিজের উপর গুলি যেন টানিয়া লইতেছে চুম্বকের মত—যেখানেই যাক, গুলি তার পিছু ধাওয়া করিবেই ! যুদ্ধক্ষেত্রে পা দিয়াই কেহ কেহ মারা পড়ে—গুলির আঘাত কেমন লাগে বোঝার আগেই। একবার যদি বন্দুকের লক্ষ্যস্থল হও তবে চল্লিশ পঞ্চাশটা গুলি তোমার গায়ে বিঁধিতে পারে। ইহাই কি অদৃষ্ট, না কেবল ঘটনাচক্র ? ১৯এ আগষ্ট তারিখে ডিভিসনের সদর তাকুসানের উত্তর ঢালুতে সরাইবার সময় ডিভিসন-নায়ক দুই ধারে দুই কর্ম্মচারী লইয়া শত্রুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটা গোলা আসিয়া নিমেষে কর্ম্মচারী দুজনের প্রাণ সংহার করিল, অথচ নায়ক দুজনের মাঝে থাকিয়াও অক্ষতদেহ রহিলেন ! কেল্লা আক্রমণের সময় যারা সামনে থাকে তাদেরই আঘাত পাওয়ার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু আসলে যারা পিছনে থাকে তাদেরই চোট লাগে বেশি। নেপোলিয়ন বলিতেন—"গুলি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইতে পারে, কিন্তু সেটা তোমাকে তাড়া করিতে পারে না ! যদি তা পারিত, তবে জগতের শেষ সীমায় পালাইয়াও তোমার নিস্তার থাকিত না, তার কবলে তুমি পড়িতেই !" গুলিটা ভূতের মত এক বিদ্‌কুটে ব্যাপার। কাহারও বলার শক্তি নাই সেটা লাগিবে না ফসকাইবে। উহা সম্পূর্ণ মানুষের বরাতের উপর নির্ভর করে। এই সূত্রে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তাইপোষানের যুদ্ধের পর দেখা গেল পলায়নপর রুশেদের মধ্যে জন পাঁচ ছয় লোক তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরেসুস্থে বেপরোয়াভাবে হাত দুলাইতে দুলাইতে চলিয়া যাইতেছে। তাদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা প্রত্যেকে ড্রিলের মাঠে লক্ষ্যভেদ অভ্যাসের সময় যেমন করিতাম তেমনি সাবধানে অনড় জিনিষের উপর বন্দুক রাখিয়া টিপ্ করিয়া

গুলি ছাড়িতে লাগিলাম—কিন্তু একটি গুলিও তাদের গায়ে লাগিল না। শেষে একজন নায়ক বলিল, নিশ্চয়ই সে মারিবে, কিন্তু সেও পারিল না। রুশেরা ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর কতবার রুশেরা কেল্লার উপর দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িয়া আমাদের ডাকিয়াছে, কখনো বা দেওয়ালের বাহিরে আসিয়া অপমান করিয়াছে—তাদের উপর লক্ষ্যভেদ শক্তির পরখ করিতে গিয়া আমাদের ক্রোধ, কৌতূহল ও দক্ষতা সত্ত্বেও বারে বারে নিষ্ফল হইয়াছি। ইহাকেই বলে নিয়তির খেলা। এইজন্যই কয়েকটা লড়াই পার হইলেই লোকে নির্ভয় অসাবধানী হইয়া ওঠে। প্রথম প্রথম ছোট একটি 'বুলেটের' শব্দে মাথা আপনি নামিয়া যায়, নায়ক ধমক দিয়া বলেন, শত্রুর গুলিকে সেলাম করে কে হে? কিন্তু তিনিও গোড়ায় শত্রুকে সেলাম না করিয়া পারেন নাই! অবশ্য, এটা মোটেই ভীরুতার লক্ষণ নয়—এ একটা স্নায়বিক ব্যাপার। কিন্তু গুলি যখন বৃষ্টিধারার মত আসিতে থাকে তখন প্রত্যেক গুলিকে সেলাম করার অবসর কোথায়? অগত্যা তখন নিমেষে সাহসী হইয়া উঠি। তখন বড় বড় গোলার গর্জ্জনেও মনে ভাবান্তর হয় না। যখন বুঝি বিকট শব্দটা কানে পৌঁছানর অনেক আগেই গোলা আমাদের ছাড়াইয়া বহুদূর চলিয়া গেছে, তখন মনে সাহস আসে, তখন আর ফাঁকা আওয়াজের সামনে মাথা নীচু করি না। তখন দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইয়া শত্রুকে কলা দেখাইয়া ভাতের নাড়ু চিবাইতে থাকি! আর গুলিগোলাও তখন দুঃসাহসীর কাছে ঘেঁসে না—পাশ কাটাইয়া গিয়া অন্যের গায়ে লাগে।

২৩

## মানুষ-'বুলেট' বৃষ্টি

সাহসীর মৃতদেহে পাহাড়ের উপর পাহাড় তৈরি হইয়া উঠিল, উপত্যকায় রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র সমাধিভূমিতে এবং পাহাড় ও উপত্যকা পোড়া মাটিতে রূপান্তরিত হইল। প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে জীবনের পর জীবন অনন্তের পথে প্রয়াণ করিতেছে। আক্রমণকারীর হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলি থাকিলে শত্রুকে ভড়কান যায় বটে, কিন্তু লড়াই ফতে হয় কিরিচ আর রণহুঙ্কারে। শাণিত কিরিচ ও ভীষণ হুঙ্কারের জোরে শত্রু রণে ভঙ্গ দিল। "লণ্ডন ষ্ট্যাণ্ডার্ড"-এর জনৈক সংবাদদাতা যথার্থই লিখিয়াছিল—জাপানীদের রণহুঙ্কার রুশেদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল!

সে যাই হোক সেই আক্রমণের কথা মনে পড়িলে চোখে জল আসে। প্রথম সমবেত আক্রমণের সময় কিরিচের ঝিলিক আর হুঙ্কারের ভীষণতা কিছুই টিকিল না, ক্রমেই সে সব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল। অসংখ্য গোলা ছুটিল, অনেক মানুষ-'বুলেট' খরচ হইল, তবুও কেল্লা দখল হইল না। রুশেরা বলিত, সে সব কেল্লা অজেয়, সে-কথা অপ্রমাণ করা গেল না। পর পর আক্রমণে দেশভক্ত যোদ্ধাদের কেবল রক্তপাত হইল, অস্থি চূর্ণ হইল। কেল্লা যথাসম্ভব শীঘ্র দখল করিতে হইবে, তাই প্রচুর লোকক্ষয় সত্ত্বেও আক্রমণের পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সেই সব নিষ্ফল আক্রমণ শেষ পর্য্যন্ত সার্থকতার পথেই আমাদিগকে লইয়া গেল।

উনিশ তারিখ থেকে রুশ কেল্লার উপর—বিশেষ করিয়া আমাদের লক্ষ্য পূর্ব্ব-চিকুয়ানষান কেল্লাগুলির উপর অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে

দেখা গেল শত্রুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। একুশ তারিখ রাত্রে যোশিনাগা ব্যাট্যালিয়নকে মার্চ করিবার হুকুম দেওয়া হইল। আগে আগে চলিল একদল অহমসাহসিক ইঞ্জিনিয়ার তারের বেড়া ভাঙিবার জন্য। ভাগ্যক্রমে তাদের মরিয়া চেষ্টা সফল হইল—পদাতিক দলের জন্য একটু পথ পরিষ্কার হইল। তখন মেজর য়োশিনাগা তাঁর দলবলকে আদেশ করিলেন, কেহ একটি গুলি ছুড়িবে না, ফিসফিস করিয়া কথা কহিবে না, অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়া কেবল অগ্রসর হইবে। ফলে শত্রুর প্রাচীরের একেবারে গা ঘেঁসিয়া একদল ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। রুশেরা ভড়কাইয়া গিয়া যুদ্ধের চেষ্টামাত্র না করিয়া পালাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু কিছুদূর পিছু হটার পরই মস্ত একদল নূতন সৈন্য দেখা দিল, তাদের পিছনে 'মেশিন্-গানের' ভীষণ আওয়াজ। পলায়নপর রুশেদের আগুয়ান হইতে বাধ্য করিয়া একত্রে তারা পাল্টা আক্রমণ করিল। তাদের 'উলা' গর্জ্জনে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। মেজর য়োশিনাগা হুকুম দিলেন তাঁর সেনাদল এক পা-ও পিছু হটিতে পারিবে না। ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। উভয় দলই ঘুষি কিরিচ ও বন্দুকের সাহায্যে মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। মেজর য়োশিনাগা একটা ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সৈন্য চালনা করিতেছিলেন, বুকে গুলি লাগায় তিনি মারা পড়িলেন। কাপ্তেন ওকুবো তাঁর স্থান লইলেন, অচিরে তিনিও নিহত হইলেন। বদলীর পর বদলী মারা পড়িতে লাগিল, পরিশেষে কেবল নায়কেরা নয়, সৈনিকেরাও প্রায় সকলেই নিহত হইল। তাদের সাহায্যের জন্য কেহ আসিল না। শত্রুর গুলিবর্ষণের বহর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট সৈনিক তারের বেড়ার নীচে গিরিসঙ্কটের মধ্যে হটিয়া গিয়া 'রিসার্ভ' সৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আসিল না। পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

সঙ্গীদের মৃতদেহের সামনে দাঁড়াইয়া বৃথায় তারা অপেক্ষা করিতে লাগিল। শত্রুর ঠিক নীচেই তারা ছিল—তাদের থেকে বারো ফুট আন্দাজ তফাতে। সেইখানে রাইফল্ শক্ত করিয়া ধরিয়া রুশেদের পানে চাহিয়া তেরো ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল, কিছুই করিতে পারিল না।

বাইশ তারিখ রাতে তাকেতোমি ব্যাট্যালিয়ন ভাঙা তারের বেড়ার মাঝ দিয়া গিয়া ভীষণ আক্রমণে পূর্ব্ব রাতের ব্যর্থতা শোধরাইবার চেষ্টা করিল। কাপ্তেন মাৎসুওকা প্রথমে আহত হইলেন, উরু কাটিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। গুলি লেফটেন্যান্ট নিয়াকের ফুসফুস ভেদ করিয়া গেল। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল, রুশেরা এমন ভাব দেখাইল যেন তারা আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল, আগের রাতের সফলতার জন্য তাদের বেজায় গর্ব্ব। তাদের সন্ধানী আলো ঘন ঘন ঘুরিয়া আক্রমণকারীদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল, আমাদের মাথার উপর তাদের তারা-বাজি ফাটিতে লাগিল, তার ফলে আমাদের প্রতি গুলি চালানো সহজ হইয়া গেল। ছুটে গিয়ে আক্রমণ করো! আগে চলো! উ-ও-আ...বলিয়া চীৎকার করিয়া কাপ্তেন য়্যানাগাওয়া নির্ভয়ে ছুটিয়া গেলেন, তারাবাজির আলোয় দেখা গেল তাঁর মুখের অর্দ্ধেকটা রক্তে লাল, ডান হাতে তিনি একখানা ঝকঝকে তলোয়ার আস্ফালন করিতেছেন। আবার তিনি হাঁকিলেন—ছুটে চলো! তাঁর নির্ভীক কণ্ঠস্বর সেই শেষবার শোনা গেল। অন্ধকারে সাদা অসিফলক ঝিলিক হানিতে লাগিল বাতাসে-দোলা নলখাগ্ড়ার মত। কিন্তু সেই ঝিলিক দেখিতে দেখিতে থামিয়া গেল, ক্ষণেক পূর্ব্বের উচ্চ চীৎকার আর শোনা গেল না—তার পরিবর্ত্তে দেওয়ালের পিছনে শত্রুর উল্লাসধ্বনি উঠিল। ঢিপির উপর উঠিয়া তারা আনন্দে

নাচিতে লাগিল, আর আমাদের সৈনিকেরা মরিয়া কেবল মড়ার পাহাড় আর রক্তের নদীই সৃষ্টি করিল।

কাপ্তেন মাৎসুওকা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন, বলিয়াছি। আহত উরুদেশ থেকে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে অচিরে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন মৃত্যুর আর দেরি নাই, তখন পকেট থেকে গুপ্ত ম্যাপগুলি বাহির করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। শত্রুর কাঁটাতারের বেড়ায় জড়ানো অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হইল। যারা তাঁর দেহ আনিতে গেল তারাও সকলে মারা পড়িল, সাহসী কাপ্তেনের পাশে তারাও চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। কাপ্তেন য়্যানাগাওয়া কয়েক স্থানে আহত হওয়া সত্ত্বেও চীৎকার করিতে করিতে শত্রুর পানে ছুটিয়া গেলেন, রুশেদের গড়-ঘেরা মাটির ঢিপিতে (rampart) লাফাইয়া উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় গুলি আসিয়া গায়ে বিঁধিল, শান্তিতে মরিবার জন্য 'র‍্যামপার্টের' আলিসায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন, তা-ও শত্রুর সহ্য হইল না, তারা তাঁহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

শত্রুর দ্বারা বারংবার বিতাড়িত বিপর্য্যস্ত হইয়াও আমরা পণ করিলাম শত্রুর আঁতে ঘা দিবই। সেইজন্য 'ব্রিগেড্' কেন, একটা গোটা 'ডিভিসন'ই ধ্বংস হইলেও ক্ষতি নাই। ২৪ তারিখ রাত তিনটায় আবার আক্রমণ করা স্থির হইল। কয়েক দিন ধরিয়া আমাদের দল য়্যাংচিয়াকু গিরিসঙ্কটে জড়ো হইয়াছিল, ২৩ তারিখ রাতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উচিয়াফ্যাঙে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমাদের কাপ্তেন তাঁর লেফটেন্যান্টদের ডাকিয়া বলিলেন—নমস্কার, বিদায়! আর কিছু বলবার নেই, স্থির করেছি কালকের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করবো! দীর্ঘ বিদায়ের জলের পেয়ালা দয়া করে' গ্রহণ করো!

কাপ্তেনের কথা শোনার আগেই আমরাও এবার মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। জলের বোতল থেকে পেয়ালা লইয়া তাহাতে জল ভরিয়া পরস্পরে আদান প্রদান চলিল, বলিলাম—আজ সন্ধ্যায় আমাদের জলের স্বাদ অমৃতের মত!

আমাদের দল নিঃশব্দে মিলন-স্থান ছাড়িয়া নদীতীরে অন্ধকার উইলোর তলে সারবন্দি দাঁড়াইল। একত্র বাসের এই শেষ বুঝিয়া কাহারও চোখের জল আর বাধা মানিল না। অচিরে 'মার্চ' সুরু হইল, তরুবীথিকার মাঝ দিয়া চলার সময় চোখে পড়িল পর পর অসংখ্য 'ষ্ট্রেচার'—গত কয়েকদিনের আহত সৈনিকেরা তার উপর বাহিত হইতেছে।

চলিতে চলিতে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় লেগেছে?

আহত লোকটি উত্তর দিল, পা দুটো ভেঙে গেছে!

"সাবাস!"

আমাদের দল, হাতীর পিঠের মত এক পাহাড়ের ওপারে নদীর ধারে গিয়া পৌঁছিল। নিবিড় অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখা যায় না। উচিয়াফ্যাঙের দিকে হাতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া চলিতে চলিতে এক জায়গায় মানুষের গলার আওয়াজ পাইলাম। চকিতে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া ঘাড় তুলিয়া অন্ধকারের মাঝ দিয়া দেখি নদীতীরে আমাদের আহতেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত পরপর শোয়ানো রহিয়াছে। আহতের সংখ্যা দেখিয়া মন খারাপ হইয়া গেল, তাহাদের অতিক্রম করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। তাদের কাতরানি, হাঁপানি, বেদনা ও কষ্ট; তার উপর এমনিভাবে রাতের হিমে অনাবৃত পড়িয়া থাকা—সব দেখিয়া শুনিয়া মন বিকল হইয়া গেল।

এদিকে আমরা পথ হারাইয়া উচিয়াফ্যাং খুঁজিয়া পাইলাম না,

ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ নবম 'ডিভিসনের' সদরে আসিয়া পৌছিলাম! দেখি কি, নায়ক জেনারেল ওশিমার পরণে শীতের কালো পোষাক—যদিও সময়টা শীতকাল নয়। তাঁর কোমরে রেশমী ক্রেপের 'ওবি' বা কোমরবন্ধ আঁটসাট করিয়া জড়ানো, তা থেকে এক লম্বা জাপানী তলোয়ার ঝুলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল রোমান্সের রাজ্যে আসিয়া পৌছিলাম। যখন তাঁর 'ডিভিসন' পান্‌লুংমান দখল করে, তখন শোনা যায়, জেনারেল এই কালো পোষাক পরিয়া সৈন্যদলের সম্মুখে নিজেকে শত্রুর বন্দুকের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বিপদকে এইরূপে তুচ্ছ করিয়া আপন সৈন্যদলে তিনি সাহস ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

একজন কর্ম্মচারীর কাছে পথের নির্দ্দেশ জানিয়া লইয়া আমরা ফিরিলাম, কিন্তু তবুও ঠিক জায়গাটি বাহির করিতে পারিলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করায় ডাহিনে যাইতে হইবে শুনিলাম, ডাহিনে গিয়া শুনি যেখান থেকে যাত্রা করিয়াছি সেখানে ফিরিতে হইবে, কোন্‌দিকে যে যাইব কিছুই বুঝিলাম না। একটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া জড়ো হইবার কথা, সে সময়ের আর বেশি দেরি নাই। যথাসময়ে পৌছিতে না পারিলে বিষম লজ্জা—ব্যক্তিগত লজ্জার কথা ছাড়িয়া দিলেও আসন্ন আক্রমণে সৈন্যসংখ্যা যত বেশি থাকে ততই সুবিধা। তা ছাড়া, আমাদের বিলম্বে পৌছানর ফলে পরাজয়ও ঘটিতে পারে! কাপ্তেন ও আমরা সকলেই অত্যন্ত অধীর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। ভাগ্যক্রমে সেই সময় ইঞ্জিনিয়ার দলের এক লোকের সঙ্গে দেখা, সে আমাদের বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল কিরূপে উচিয়াফ্যাং পৌছিতে হইবে—একটু আগে একটা পথ আছে, সেখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা 'ট্রেঞ্চ' খোঁড়ার কাজ করিতেছে, সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে।

নির্দ্দেশমত চলিয়া অচিরে আমাদের অবরোধ-খাত দেখিতে পাইলাম, তার পাশে পাশে চলিয়া শেষে একটা ফাঁকের মুখে পৌঁছিলাম। সেটা পার হইয়া মাঠের মাঝ দিয়া শত্রুর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যাইতে হইল। ছুটিয়া চলিতেছি এমন সময় সন্ধানী আলোর ঝিলিক। হুকুম হইল—শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো! নিশ্বাস রুধিয়া শুইয়া পড়িয়া সেই মারাত্মক আলোর বিদায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! কিন্তু 'সার্চ্চলাইট' আর সরে না। ওদিকে পিছনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হইল। শেষ পর্য্যন্ত এক জায়গায় পৌঁছিলাম, অনুমান হইল, সেইখানেই সকলের জড়ো হইবার কথা। সেখানে আমাদের একজনও সৈনিক নাই, ইতস্তত ছড়ানো মৃতদেহ কালো দেখাইতেছে। সম্ভবত আমাদের সৈন্যদল ইতিমধ্যে পূর্ব্ব পান্‌লুং-কেল্লার পাদমূলে জড়ো হইয়াছে, কে জানে হয়ত সেইটাই আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। ঘড়িতে একটা বাজিয়া কয়েক মিনিট গত হইয়াছে। প্রধান দলকে খুঁজিয়া বার করিবার সকল চেষ্টা বৃথায় গেল। আমরাই কি দেরি করিয়া ফেলিলাম? কাপ্তেনের উদ্বেগের সীমা নাই—নৈরাশ্যের সে কী যন্ত্রণা! সমবেত আক্রমণে যোগ দিবার সুযোগ কি আমরা হারাইলাম? কাপ্তেন বলিল, আত্মহত্যা করলেও আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না!

কেবল তাঁর নয়, সকলেরই মনে হইতে লাগিল, এই যুদ্ধে যোগ দিতে না পারিলে চিরদিনের জন্য আমাদের দলের মুখে কালি পড়িবে—সে লজ্জার তুলনায় আমাদের একত্রে আত্মহত্যাও অকিঞ্চিৎকর।

চারিদিকে চর ছুটিল, কিন্তু কেহই কোনো খবর আনিতে পারিল না। আর সময় নাই, তাই স্থির হইল এখন পূর্ব্ব পান্‌লুঙের পুরানো কেল্লায় যাওয়াই কর্ত্তব্য। তেমন তেমন হইলে নিজেরাই লড়িব। আর যদি প্রধান দল সে সময়ের মধ্যে যুদ্ধ সুরু করিয়াই থাকে, তবে ত

কথাই নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেই চলিবে। ঐ যে মাঝে মাঝে মেশিন্‌-গানের শব্দ—নিশ্চয়ই পান্‌লুং থেকে আসিতেছে। এক গিরিসঙ্কটও আবিষ্কার হইল, তার ভিতর দিয়া পাহাড়ে পৌছান যাইবে ভাবিয়া উচিয়াফ্যাং থেকে সেই গভীর সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রস্থে চার হাতেরও কম সেই গিরিসঙ্কট। পূর্ব্বদিন সেখানে নবম 'ডিভিসন' এবং দ্বিতীয় 'রিসার্ভ'-এর সপ্তম ও নবম দল দারুণ লড়িয়াছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার—'ষ্ট্রেচার' নাই, ওষুধ নাই, ইতস্তত কোণে ঘুঁজিতে হত ও আহত উপর উপর গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, কেহ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, আর কেহ একেবারে স্থির নিস্পন্দ বিগতপ্রাণ। তাদের না মাড়াইয়া চলা দুষ্কর। মৃত ও প্রায়-মৃতে ভরা সে এক নরক! মৃত সঙ্গীকে মাড়াইবার ভয়ে ডাইনে চলিতে গিয়া বাঁয়ের আহতকে পদাঘাত করিয়া ফেলি। মাটির উপর চলিতেছি ভাবিয়া পা বাড়াইয়া দেখি খাকী রঙের মৃতকে মাড়াইয়া যাইতেছি। "মড়ার উপর পা দিয়ো না" বলিয়া অনুচরদিগকে সতর্ক করার মুহূর্ত্তেই দেখি নিজে মড়ার বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছি। তখন আর কি করি, অনুতপ্ত চিত্তে উদ্দেশে বলি—ক্ষমা করো ভাই, ক্ষমা করো! দেখতে পাইনি—এ অপমান অনিচ্ছাকৃত! দীর্ঘ সরু পথ মড়ায় ভরা—হতভাগা বাক্যহারা সঙ্গীদের না মাড়াইয়া চলি কিরূপে?

গিরিসঙ্কটের প্রায় শেষে আসিয়া পড়িয়াছি, আর কয়েক পা অগ্রসর হইলেই কাঁটাতারের বেড়ার সামনে আসিয়া পড়িব, এমন সময় ক্ষণেকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বামে শত্রুর 'মেশিন-গান' অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করিতে সুরু করিয়াছে।

তখনি একটি গোলন্দাজ দলের শব্দ পাইলাম, আমাদের ছয়টি কামান সেই পথ দিয়াই পান্‌লুং উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে পদাতিক ও গোলন্দাজ গাদাগাদি করিয়া রুশের 'মেশিন গান' এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে পাহাড় আমাদের লক্ষ্য এখন তার তলায় আসিয়া পৌছিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রধান দলের চিহ্নমাত্র নাই! ব্যাপার কি, তারা গেল কোথায়? আক্রমণ স্থগিত রহিল না কি? অনেক চিন্তার পর কাপ্তেন স্থির করিলেন উচিয়াফ্যাঙে ফিরিয়া গিয়া নূতন আদেশের অপেক্ষা করিবেন। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত অবশ্য আমরা মানিতে বাধ্য যদিও খুব অনিচ্ছায়। আবার সেই গলি, আবার সেই নরক অতিক্রম! একবার ভায়েদের মৃতদেহ মাড়াইয়া ক্ষমা চাহিয়াছি, আবার সেই বীভৎস কাজ করিতে হইবে।

অন্ধকারে আবার হতাহতকে হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়, কারণ আমাদের পরে সেই পথ দিয়াই গোলন্দাজেরা গিয়াছে, কামানের গাড়ির চাকা অনেক হতাহতকে পিষিয়া দিয়াছে। যে-প্রাণ ধুক্‌ধুক করিতেছিল, লোহার চাকার তলে পড়িয়া তা থামিয়া গেছে; যে-দেহে প্রাণ ছিল না তা খণ্ডবিখণ্ড শতছিন্ন। চূর্ণ অস্থি, ছিন্ন মাংস এবং রক্তধারা ভাঙা তলোয়ার ও চৌচির বন্দুকের সঙ্গে একাকার হইয়া আছে।

আবার গিরিসঙ্কটের মুখে ফিরিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখিলাম অন্ধকারের মাঝ দিয়া দলের পর দল ছায়ার মত কাহারা আসিতেছে—এই আমাদের প্রধান দল—ইহাদের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ কী উৎকণ্ঠায় কাটিয়াছে! আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। শুনিলাম, তারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে নাই—

শত্রুর সন্ধানী আলোর উৎপাতে। সে যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত প্রধান দলের নাগাল পাইয়া আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। আমরাই আক্রমণের সূত্রপাত করিব ভাবিয়া খুব আনন্দ হইল। এই জায়গাটা শত্রুর গোলাগুলি থেকে আমাদের আড়াল করে না, এমন প্রশস্তও নয় যে অনেক লোক ধরিতে পারে; কেবল একটা খাড়া পাহাড় ইহাকে আগলাইয়া আছে—সেটা থাকায় শত্রু আমাদের পানে নীচু হইয়া চাহিতে পারে না। এখানে নায়কেরা যাঁহারা আছেন তাঁদের মধ্যে মেজর মাৎসুমুরা একজন। তাকুষান্ আমাদের দখলে আসার পর শত্রুর পালটা আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। সে-সময়ে তাঁর ডান পা মচকাইয়া যায়, সেই আঘাতের জন্য তিনি ডাক্তারের সাহায্য লইতে রাজী হন নাই—তাঁর মতে সে-আঘাত অতি তুচ্ছ। তিনি এখনো বেতের লাঠির উপর ভর দিয়া ব্যাট্যালিয়ন চালনা করিয়া থাকেন। আজও তাঁর পায়ে যন্ত্রণা আছে, তবু নিজের দলের আগে আগে লাঠিতে ভর দিয়া আসিলেন। আমার পাশে বসিয়া বলিলেন, এতদিনে সময় এসেছে!

কাপ্তেন সেগাওয়া, যিনি তাকুষানে ছোট ভাইয়ের কাছে শেষ বিদায় লইয়াছিলেন, তিনিও উপস্থিত। লেফটেন্যান্ট সোনে আসিল—হাতে বন্দুক এবং কোমরে কার্ত্তুজের বেল্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ অপূর্ব্ব সাজ কেন? সে বলিল, কাল রাতে চরের কাজ করিতে গিয়া তলোয়ারখানি হারাইয়াছে, তাই সাধারণ সৈনিকের অস্ত্রই লইতে হইল! নায়কেরা সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের সাফল্য কামনা করিয়া কিছুক্ষণ গল্পসল্প করিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে কয়জন ইহলোকে থাকিবে কে বলিতে পারে!

২৪

## 'নিশ্চিত-মৃত্যু' দল

খাড়া পাহাড়টার তলায় সকলে জড়ো হইয়া চলার আদেশের অপেক্ষায় আছি, এমন সময় এক টুকরা কাগজ হাতে হাতে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। খুলিয়া পড়িলাম—"য়্যাসুকিচি হন্দা এ মাসের উনিশ তারিখে গুলির ঘায়ে মারা পড়েছে। আহত অবস্থায় তাকে যখন জল পান করতে দিলুম, তখন সে কাঁদতে লাগলো, আর লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাইকে বিদায়-নমস্কার দিতে বল্লে। ইতি—বুন্‌কিচি তাকাও।"

বছরখানেক আগে এই হন্দা আমার ভৃত্যের কাজ করিত। লোকটি বিশ্বাসী, তার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, অথচ অন্তিমকালে সে আমাকেই নমস্কার জানাইয়াছে! ভাবিলে দুঃখ হয়, তার জীবদ্দশায় একটু বিদায়-সম্ভাষণও করিতে পারিলাম না!

আমার দলবলকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—এবার তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নেব। প্রাণপণ শক্তিতে লড়বে। পোর্ট-আর্থার দখল হবে কি-না তা এ যুদ্ধে বোঝা যাবে। এই নাও জল, ভাবো এটা মৃত্যুক্ষণে পান করছো!

একটি পাত্র জলে ভরিলাম। সে-জল দুই একজন সৈনিক জীবন সঙ্কট করিয়া লইয়া আসিল। সেই একই পাত্র থেকে আমরা বিদায়-পান করিলাম। পান্‌লুঙের ধার দিয়া আধাপথ বরাবর একটা জায়গায় উঠিবার আদেশ আসিল। নিঃশব্দে চলিতে সুরু করিলাম—আমরা যারা একত্রে ক্ষণকাল পূর্ব্বে চিরবিদায়-পেয়ালা থেকে পান করিয়াছি, আমরা আবার সেই সাথীদের মৃতদেহে-ভরা ভয়ানক গিরিসঙ্কটের ভিতর

দিয়া চলিলাম। এই তৃতীয়বার এই পথ অতিক্রম করিতেছি, চতুর্থবার জীবিত অবস্থায় কেহই এ পথ অতিক্রম করার আশা রাখে না। সকলেরই ইচ্ছা ও সঙ্কল্প উদীয়মান-সূর্য্য-পতাকার তলে স্বদেশের প্রতি মহান্ কর্ত্তব্য সাধনকালে মৃত্যুলাভ। এই শেষ যুদ্ধ যাত্রার আগে আমরা সকলেই যথাসম্ভব হাল্‌কা হইলাম—দিন দুই তিন চলার মত শক্ত বিস্কুট সঙ্গে রহিল, বাদবাকি জিনিস ফেলিয়া আসিলাম। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলানো একখণ্ড জাতীয় পতাকা আমার খাকী পোষাকের শোভা বাড়াইল, গলায় একখানা জাপানী তোয়ালে বাঁধিলাম। পায়ে জুতা নাই—কেবল নেকড়ার 'তাবি'।* অদ্ভুত সাজে আমার মূর্ত্তি হইল গ্রীষ্মের পল্লী-উৎসবের নর্ত্তকের মত। এই বেশে তলোয়ার, জলের বোতল ও তিনখানা শক্ত বিস্কুট লইয়া মহান্ মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে চলিয়াছি!

সেই গিরিসঙ্কটের কথা মনে পড়িলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। মড়ার গাদা মাড়াইয়া ডিঙাইয়া নাক চাপিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটা ঘুঁজির মধ্যে দেখি এক আহত সৈনিক বসিয়া বসিয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে। কোথায় চোট লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তার দুই পা ভাঙিয়াছে, গত তিন দিনে কণামাত্র খাদ্য বা পানীয় জোটে নাই, তাহাকে লইবার জন্য কোনো 'ষ্ট্রেচার' আসে নাই—যুদ্ধে আহত হইবার পর থেকে সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু এমনি কপাল যে মরণও তাহাকে ভুলিয়াছে!

আমার তিনখানা বিস্কুট তাহাকে দিলাম। বলিলাম, আপাতত এই খেয়ে ধৈর্য্য ধরে' বাহকের জন্যে অপেক্ষা করো! কৃতজ্ঞতায় আনন্দে

* পায়ের গাঁট পর্য্যন্ত বিস্তৃত জাপানী মোজা।

সে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বারবার আমার নাম জানিতে চাহিল। মনটা কেমন হইয়া গেল, আগু বাড়িয়া চলিলাম, 'বিদায়' বলা ছাড়া আর কিছু তাহাকে বলা হইল না। এইবার আমরা পান্‌লুং-যানের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসিয়া হাজির হইলাম।

পান্‌লুঙের এই কেল্লা নবম 'ডিভিসন' এবং দ্বিতীয় 'রিসার্ভ'-এর সপ্তম ও অষ্টম রেজিমেণ্টের রক্তমাংসের দ্বারা দখল হইয়াছে। এখন এ জায়গার খুব কদর, এখান থেকেই পূর্ব্ব চিকুয়ান্ ও ওয়ান্‌তাইয়ের উত্তরের কেল্লাগুলোর উপর হানা দেওয়া হইবে। জেনারেল ওশিমার সৈনিকদের সাহস ও মারাত্মক যুদ্ধের ফলে এ জায়গা দখলে আসিয়াছে। গিরিসঙ্কটের ভীষণ দৃশ্যে সেই বিষাদময় কাহিনী প্রকাশিত।

তারের বেড়ার ফাঁক দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও সৈনিক মরিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে—কেহ তারের বেড়ায় জড়াইয়া গেছে, কেহ বা দুই হাতে একটা খোঁটা বা বড় লোহার কাঁচি চাপিয়া আছে!

পান্‌লুঙের পার্শ্বদেশের মাঝামাঝি পৌছিয়া দেখি মাথার উপরে অন্ধকারে আমার বাহিত সেই পুরানো পতাকা উড়িতেছে। দেখিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। হাতে পায়ে হামা দিয়া নিশানের কাছে উঠিয়া কর্নেল আওকির সামনে গিয়া পড়িলাম। দিনকয় আগে তাকুযানের তলায় তাঁর কাছে বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

"কর্নেল! আমি লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই!"

তিনি আমার পানে চাহিয়া যেন অতীত দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মুখে বলিলেন—ও, সাকুরাই! বেশ বেশ! তোমার সাফল্য কামনা করি!

এমন সময়ে শুনিলাম পাহাড়ের মাথা থেকে আমার নাম ধরিয়া

কে যেন ডাকিতেছে। সেখানে গিয়া দেখি লেফটেন্যান্ট য়োশিদা একলা বসিয়া আছে। সে আমার বন্ধু, আমরা একই জেলার লোক। শুনিয়াছিলাম সে নবম ডিভিসনে আছে এবং পোর্ট-আর্থারের সামনে লড়িতেছে। তার সঙ্গে দেখা হইবে আশা ছিল না। ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার আগে পুরানো বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ বড়ই করুণ।

বিষণ্ণভাবে সে বলিল, সাকুরাই! গত দিনদুই তিন বড় ভয়ানক লড়াই গেছে, কি বলো?

তার সেখানে থাকার হেতু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে একলা বসে' করছো কি?

"মড়াগুলোর পানে একবার চাও!"

তার আশপাশে কালো কালো ছায়া—ভাবিয়াছিলাম সে-সব আমাদের রেজিমেন্টের লোক। যখন দেখিলাম সেই খাকীপরা লোকের গাদা য়োশিদার দলের হত ও আহত সৈনিক, তখন অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই তিন কোথাও বা চারিটি করিয়া দেহ উপরে উপরে গাদা করা। শত্রুর কামানের উপর হাত রাখিয়া কেহ মরিয়া আছে, কেহ 'ব্যাটারি' অতিক্রম করিয়া গিয়া কামানের গাড়ি আঁকড়াইয়া মরিয়া আছে। মড়ার তলায় আহতেরা চাপা পড়িয়া গোঙাইতেছে। এই দুঃসাহসীর দল যখন সঙ্গীদের দেহ মাড়াইয়া শত্রুর কেল্লার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল তখন "মেশিন-গান"এর গুলি কেল্লার সন্নিকটে তাহা-দিগকে নিঃশেষে সংহার করিয়াছে—আহতদের উপর মড়ার স্তূপ রচিত হইয়াছে। পিছনে যারা ছিল তারা রাগের মাথায় সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য শত্রুর পানে ছুটিয়া গিয়া মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। লেফটেন্যান্ট য়োশিদা হতভাগ্য অনুচরদের ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই—তাহাদেরই দেহাবশেষের পানে চাহিয়া বসিয়া

আছে! পরে ২৭ অক্টোবর তারিখে এরলুংযানের ভীষণ যুদ্ধে সে মারা পড়ে। পান্‌লুঙের মাথায় এই দেখা আমাদের শেষ দেখা।

সকলে একত্র হইবার পর কর্নেল উঠিয়া শেষ উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, এই যুদ্ধ আমাদের পক্ষে দেশসেবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ! আজ রাতে পোর্ট-আর্থারের আঁতে ঘা দিতে হবে! আমাদের কেবল মরতে কৃতসঙ্কল্প হলেই চলবে না; আমাদের মরাই চাই! আমি তোমাদের পিতৃস্থানীয়, বরাবর তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছ, সেজন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, ব'লে বোঝাতে পারি না! সকলকেই বলি, যথাসাধ্য ক'রো!

ঠিক, জাপান ছাড়ার সময়ই আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। অবশ্য, যারা যুদ্ধে যায় তারা প্রাণ লইয়া ফেরার আশা রাখে না। কিন্তু এই বিশেষ যুদ্ধে কেবল মরিতে প্রস্তুত থাকিলেই চলিবে না—'মরিবই' এই সঙ্কল্প চাই।

এবার এই আক্রমণের মহিমা ও ভীষণতা বিবৃত করি। আমি সামান্য লেফটেন্যান্ট মাত্র, আমার মনের মাঝে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত হইয়া আছে—আমার কাহিনী অন্ধকার থেকে জিনিষ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তোলার মত হইবে। ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কেবল টুক্‌রা-টুক্‌রা স্মৃতিই দিতে পারিব। এই কাহিনী যদি আমার আপন কীর্ত্তির বড়াইয়ের মত শোনায়, তার কারণ ইহা নয় যে আমি নিজের গুণে আত্মহারা, তার কারণ এই যে, যে-সব ব্যাপার ব্যক্তিগত এবং আমার আশপাশে ঘটিয়াছে, আমি কেবল তাহাই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই খণ্ডিত বিবরণ যদি এই ভীষণ লড়াইয়ের গোটা গল্পটা অনুমানে সহায়তা করে, তবে আমার চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব।

'নিশ্চিত-মৃত্যু' দলের লোকেরা কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করে নাই, নির্ভয়ে তারা মৃত্যুমঞ্চে আরোহণ করিল। পান্‌লুংযান্ উত্তীর্ণ হইয়া গাদা-করা মড়ার মাঝ দিয়া তাহারা পথ করিয়া চলিল। এক এক দলে পাঁচ ছয় জন করিয়া সৈনিক পরে পরে বেড়া-দেওয়া ঢালুতে গিয়া পৌঁছিল!

কর্নেলকে বলিলাম, আসি তবে কর্নেল!

বিদায় লইয়া চলিতে সুরু করিলাম। আমার প্রথম পদক্ষেপ এক মড়ার মাথার উপর। পূর্ব্ব-চিকুয়ানের উত্তরের কেল্লা ও ওয়াংতাই পাহাড় আমাদের লক্ষ্য।

শত্রুর skirmish খাতে বোমা লইয়া লড়াই সুরু হইল। আমাদের বোমাগুলো খাসা ফাটিতেছে—জায়গাটায় দেখিতে দেখিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গেল। তক্তাগুলো ছিটকাইয়া পড়িতেছে, বালিভরা বোরাগুলো ফাটিতেছে, নরমুণ্ড শূন্যে উড়িতেছে, ধড় থেকে পা ছিঁড়িয়া আলাদা হইতেছে। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের শিখা মিলিয়া একটা অদ্ভুত লাল আভায় আমাদের মুখ উদ্ভাসিত হইল, মুহূর্ত্তে সৈন্যশ্রেণী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আর আশা নাই ভাবিয়া শত্রু সেস্থান ছাড়িয়া পালাইতে সুরু করিল।

"চলো, চলো, আগে চলো, এই অগ্রসর হওয়ার সুযোগ! ওদের তাড়া করো, এক লাফে জায়গা দখল করো!" বিজয়গর্ব্বে আমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হইলাম।

কাপ্তেন কাওয়াকামি তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন, অগ্রসর হও! তখন আমি তার পাশে দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম, সাকুরাইয়ের দল অগ্রসর হও!

এমনিভাবে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আমি কাপ্তেনের বাঁ দিক ছাড়িয়া

চলার পথের সন্ধানে গড়-ঘেরা ঢিপির (rampart) উপরের পথে চলিলাম। আমাদের চোখের সামনে ওই কালো পদার্থটা কি? উত্তর কেল্লার 'র‍্যাম্পার্ট'। পিছু ফিরিয়া দেখি একটি সৈনিকও নাই। তাই ত, দলছাড়া হইয়া পড়িলাম না কি? ভয়ে ভয়ে সাবধানে দেহটা বাঁয়ে হেলাইয়া বারো নম্বর কম্পানিকে ডাকিতে লাগিলাম।

যতবার ডাকি উত্তর আসে—লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই! শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া গিয়া দেখি কর্পোর‍্যাল ইতো সশব্দে কাঁদিতেছে।

"ব্যাপার কি? কাঁদছো কেন?"

কান্না থামিল না। কর্পোর‍্যাল আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই, আপনি ত এবার মাতব্বর হলেন!

"কান্নার কি কারণ? খুলেই বল না!"

সে আমার কানে কানে বলিল, আমাদের কাপ্তেন মারা পড়েছেন!

শুনিয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। এই ত এক মুহূর্ত্ত আগে তিনি হুকুম করিলেন, আগে চলো! এইমাত্র যাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল সেই কাপ্তেন আর ইহলোকে নাই? এক মুহূর্ত্তে আমাদের কোমলপ্রাণ স্নেহময় কাপ্তেন কাওয়াকামি ও আমি দুই ভিন্ন জগতের জীবে পরিণত হইলাম। এ কি সত্য, না স্বপ্ন?

কর্পোর‍্যাল ইতো কাপ্তেনের দেহ দেখাইয়া দিল, নিকটেই র‍্যামপার্টে যাওয়ার পথের উপর পড়িয়া আছে। ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে সেই দেহ তুলিয়া লইলাম।

"কাপ্তেন!..."

আর একটি কথাও মুখে সরিল না। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেও চলিবে না, কাপ্তেনের কাছে যে গুপ্ত ম্যাপ ছিল তাহা লইয়া নির্ভয়ে

দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাঁকিয়া বলিলাম—এখন থেকে আমিই বারো নম্বর কম্পানির নায়ক !

হুকুম দিলাম, আহতদের মধ্যে কেহ কাপ্তেনের দেহ লইয়া যাক। একজন আহত সৈনিক দেহটি তুলিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় মোক্ষম স্থানে আঘাত পাইয়া কাপ্তেনের গায়ে ঢলিয়া সে মারা গেল। তার স্থান লইতে গিয়া সৈনিকের পর সৈনিক মারা পড়িতে লাগিল।

লেফটেন্যাণ্ট নিয়োমিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেকসন্'-গুলো একত্র আছে ত ?

সে বলিল, হাঁ।

কর্পোর‍্যাল ইতোকে আদেশ দিলাম, সৈন্যশ্রেণী যেন ঠিক থাকে, যেন জোড়ভঙ্গ হইয়া না যায় ! বলিলাম, দলের মাঝখানে থাকিব আমি। অন্ধকারে জায়গাটার চেহারা দেখা যায় না, কোন্‌দিকে চলিতে হইবে তারও ঠিকানা নাই। অন্ধকার আকাশের গায়ে উত্তরের কেল্লা ও ওয়াংতাই পাহাড় খাড়া উঠিয়াছে। সামনে এক প্রাকৃতিক দুর্গ, আমরা আছি কটাহের মত নাবাল জমির মধ্যে, তবুও আমরা পাশাপাশি 'মার্চ' করিয়া চলিলাম।

"বারো-নম্বর দল, আগে চলো !"

ডানদিকে ফিরিয়া স্বপ্নের ঘোরে যেন আগাইয়া চলিয়াছি। সে সময়ের কিছুই স্পষ্ট মনে পড়ে না।

"লাইন যেন না ভাঙে !"

এই আমার একমাত্র আদেশ। কর্পোর‍্যাল ইতোর গলা আর শুনিতে পাই না—সে আমার ডাইনে ছিল।

অন্ধকারে কিরিচগুলো ঝিকমিক করিতেছিল, সেগুলো আর তেমন

দেখিতে পাইতেছি না। অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল এখন মাত্র কয়েকজনে আসিয়া ঠেকিল। সহসা মাটির উপর তালগোল পাকাইয়া পতন—যেন মুগুরের ঘায়ে আহত হইয়াছি। ডানহাতে চোট লাগিয়াছে। শত্রুর চমৎকার ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ আলো ঝিলিক দিয়া উঠিল, সেই আলোয় মড়ার গাদা দেখিতে পাইলাম। আহত হাতখানা তুলিয়া দেখি কব্জির কাছে ভাঙিয়াছে। হাতখানা ঝুলিতেছে, তা থেকে হু হু করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। তৈরি ব্যাণ্ডেজ বার করিয়া ত্রিকোণ টুকরা দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিলাম। তার উপর একখানা রুমাল জড়াইয়া উদীয়মান্ সূর্য্যপতাকা দিয়া গলা থেকে ঝুলাইয়া দিলাম—সেই পতাকাই শত্রুর কেল্লার উপর বসাইবার পণ করিয়াছিলাম!

মাথা তুলিয়া দেখি আমার ও ওয়াংতাই পাহাড়ের মাঝে কেবল একটি উপত্যকা—পাহাড়ের মাথা যেন প্রায় আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। দারুণ তৃষ্ণা, কোমর হাতড়াইয়া দেখি জলের বোতল নাই—কেবল তার চামড়ার বন্ধনীটা আমার পায়ে জড়াইয়া আছে। সৈনিকদের গলার আওয়াজ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ওদিকে ঘৃণ্য শত্রুর 'রকেটের' চোখ-ঝলসানো আলো আর তোপের শ্রবণ-বিদারী আওয়াজ বাড়িয়া চলিয়াছে। আস্তে আস্তে পা-গুলো ঘষিয়া দেখি সেগুলো অক্ষত আছে, তখন উঠিলাম। তলোয়ারের খাপ ফেলিয়া দিয়া তলোয়ারখানা বাঁ হাতে লাঠির মত করিয়া ধরিয়া ঢালু বাহিয়া নামিয়া চলিলাম—যেন স্বপ্নে চলিতেছি! মাটির দেওয়াল ডিঙাইয়া ওয়াংতাই পাহাড়ে চড়িতে সুরু করিলাম।

সামনে দীর্ঘাকার অতিকায় কামানগুলো উঁচু হইয়া আছে—আমার দলের কজনই বা এখনো বাঁচিয়া আছে কে জানে! যারা বাঁচিয়া আছে তাদের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিলাম—আমাকে

অনুসরণ করো ; কিন্তু কেহই আমার ডাকে সাড়া দিল না। মনে হইল, অন্য দলগুলোর অবস্থাও নিশ্চয়ই এমনি—ভাবিয়া বুক যেন দমিয়া যাইতে লাগিল। তাজা সৈন্যদল আসিয়া সাহায্য করিবে, সে আশা নাই ; তাই একজন সৈনিককে আদেশ দিলাম—র‍্যামপার্টে উঠে সূর্য্য-পতাকা বসিয়ে দাও! কিন্তু হায়, চোখের নিমেষে গুলির ঘায়ে সে মরিল—মুখ দিয়া একটা আওয়াজও সরিল না।

হঠাৎ আমার চারিদিক দিয়া একটা বিকট শব্দ উঠিল—যেন লোকান্তর থেকে।

পাল্টা আক্রমণ !

র‍্যাম্পার্টের উপর কালো কাঠের দেওয়ালের মত আবির্ভূত হইল একদল শত্রু। নিমেষে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া উল্লাসে তারা চীৎকার করিয়া উঠিল। এমনভাবে আছি যে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, তা ছাড়া আমরা সংখ্যায় এত কম যে তাদের সঙ্গে লড়াও যায় না। খাড়া পাহাড় বাহিয়া পিছু হটিতে হইল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি শত্রু পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া গুলি ছাড়িতেছে। পূর্ব্বে যে মাটির গড়ের কথা বলিয়াছি, তার কাছে পৌঁছিয়া শত্রুর মুখোমুখি ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। বিষম সোরগোল বীভৎস হত্যাকাণ্ড সুরু হইয়া গেল।

কিরিচে কিরিচে ঠোকাঠুকি বাধিল, শত্রু একটা 'মেশিন্-গান্' বাহির করিয়া আমাদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাইতে লাগিল—দু পক্ষেই মানুষ পড়িতে লাগিল কাস্তের মুখে ঘাসের মত। সে-দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারিব না, কারণ তখন আমার আচ্ছন্ন অবস্থা। কেবল মনে আছে ভীষণ আক্রোশে তলোয়ার ঘুরাইতেছি, মাঝে মাঝে মনে হইল শত্রুকে কাটিয়া ফেলিতেছি। মনে পড়ে একটা এলোমেলো লড়াই, সাদা ফলকের উপর সাদা

ফলকের আঘাত, 'শেলের' শিলাবৃষ্টি, ধাক্কাধাক্কি, কাটাকাটি, মারাত্মক হাতাহাতি। শেষে গলা এমন ধরিয়া গেল যে, আর চেঁচাইতে পারি না। হঠাৎ সশব্দে আমার তলোয়ার ভাঙিয়া গেল—আমার বাঁ হাত বিদীর্ণ হইয়াছে। পড়িয়া গেলাম। উঠিবার আগেই একটা 'শেল্' আসিয়া আমার ডান পা গুঁড়া করিয়া দিল। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনে হইল যেন ভাঙিয়া পড়িতেছি—সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে মাটিতে হুড়মুড় করিয়া পড়িলাম।

এক সৈনিক আমাকে পড়িতে দেখিয়াছিল। সে বলিল, লেফটেন্যান্ট সাকুরাই! আসুন আমরা একসঙ্গে মরি!

বাঁ হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। চারিদিকে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে—অক্ষম অসহায় পড়িয়া পড়িয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। মনে দারুণ উন্মাদনা, কিন্তু দেহ অচল অবশ!

২৫

## মৃত্যুর মাঝে জীবন

উভয় পক্ষের হতাহতে-ভরা যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ২৪শে আগষ্ট তারিখের দিবাগম হইল। যাহাকে জড়াইয়া আছি, সে কেন্‌সুকে-ওনো—এ সৈনিক আমার কাছেই শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার ডান চোখের পাশ দিয়া গুলি বিঁধিয়াছিল। মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া সে আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আমারই সঙ্গে মরার প্রস্তাব করে। বেচারা! তাহাকে জড়াইয়া আমার বাঁ হাত, তাহাতে গাঢ় রক্তের ছোপ—ওনোর গলার

উপর দিয়া সেই রক্ত বহিয়া যাইতেছে। ওনো সন্তর্পণে আমার হাত সরাইল, নিজের ব্যাণ্ডেজ বাহির করিয়া আমার বাঁ হাত বাঁধিয়া দিল।

এমনিভাবে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় শত্রু-পরিবৃত হইয়া পড়িয়া রহিলাম—মুক্তির কণামাত্র আশা দেখিতে পাইলাম না। মৃত্যু যদি না হয় তবে নিঃসন্দেহ অচিরে শত্রুর হাতে পড়িব—সে-দুর্ভাগ্য মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশি অসহনীয়। সেই অপমান এড়াইবার জন্য মন আত্মহত্যা করার জন্য ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে কোনো অস্ত্র নাই, হাতও নাই যে অস্ত্র পাইলে ধারণ করিতে পারে! দুঃখে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

"ওনো, ভাই, আমাকে মেরে ফেল, তারপর এখান থেকে ফিরে গিয়ে এখানকার অবস্থা জানাও"—এই বলিয়া তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। কত কাকুতি-মিনতি করিলাম, কিন্তু সে শোনে না। সে প্রায় অন্ধ, তার দুই চোখই রক্তে ঢাকা পড়িয়াছে, তবুও সে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমি রক্ষা করবো...

তার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলাম, আমাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। শত্রুর গতিগতির বদল হইয়াছে, তারা পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে, আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, কাল রাত থেকে আমরা শত্রুর এলাকার অনেকটা ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি, এমনি অসহায় অবস্থায় থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের বন্দী করিবে—তাহাকে কত মতে বুঝাইলাম, তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রুশের হাতে বন্দী হইতে কেমন লাগিবে? আমি অচল অনড় অবস্থায় পড়িয়া আছি, হাত পা নাড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, আমাকে এখনি মারিয়া ফেলিলেই, আমার সবচেয়ে বেশি উপকার করা হইবে, তারপর তুমি পালাইতে পারিবে—তাহাকে

বলিলাম। কিন্তু ওনোর কাণ্ডজ্ঞান নাই, সে কেবল বলিতে লাগিল—আমি রক্ষা করবো!

নিরুপায় বোধে হাল ছাড়িয়া দিয়া সেখানেই মরিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু তবুও ওনোকে পাঠাইয়া যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইবার জন্য অধীর হইলাম। বলিলাম—যাও তবে, 'ষ্ট্রেচার' নিয়ে এস, আমি যাবো। চটপট করো! বেশ জানি 'ষ্ট্রেচার'-বাহক এই গিরিসঙ্কটে কিছু পৌঁছিতে পারিবে না—এই শত্রু-পরিবৃত স্থানে আসার ত কথাই নাই। কেবল আশা—এইরূপে ওনো জীবিত অবস্থায় আমাদের প্রধান দলের কাছে ফিরিবার সুযোগ পাইবে এবং আমার মৃত্যুর খবরটাও দিতে পারিবে!

আমার কথা শুনিয়া ওনো পাগলের মত লাফাইয়া উঠিল। আচ্ছা থাকুন এখানে, আসচি—বলিয়া মাটির দেওয়ালের পানে ছুটিয়া গিয়া অদৃশ্য হইল। শত্রুর বাধা ভেদ করিয়া সে কি আমাদের প্রধান-আড্ডায় পৌঁছিতে পারিবে?

ওনো চলিয়া গেল, মৃত ও মৃতপ্রায় সৈনিকদের মাঝে আমি একলা পড়িয়া রহিলাম। আমার জীবনে এই সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—গভীরতম দুঃখের ও চরম হতাশার মুহূর্ত্ত। নেল্‌সনের কথা আপনমনে বলিতে লাগিলাম—ভগবানের অশেষ করুণা, আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি! ব্যর্থ হইলেও সারা জীবনের কাজ করিয়াছি—এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। আর কিছুই ভাবি নাই। এই কথাটি কেবল বুঝিলাম যে পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবকের হৃদিরক্ত দ্রুতগতি ঝরিয়া ঝরিয়া অচিরে নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতের বেদনা মোটেই অনুভব করিলাম না। অদূরে রুশেরা খাতের মধ্যে যাওয়া আসা করিতেছে, আমাদের দলে যারা এখনো বাঁচিয়া আছে তাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছে, প্রত্যেকে পালা করিয়া পাঁচ ছয়টি

বন্দুক ব্যবহার করিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তাদের কীর্ত্তি দেখিতেছি, এমন সময় তাদের একজন লক্ষ্য করিল যে, আমি তখনো বাঁচিয়া আছি। অপর রুশেদের সে সঙ্কেত করিল, অমনি তিন চারিটা গুলি আমার পানে ছুটিয়া আসিল। বন্দুকের মাথায় কিরিচ চড়াইয়া লাফাইয়া তারা আমার দিকে ধাবিত হইল। চোখ বুজিলাম—এবার আমাকে হত্যা করিবে! প্রথমত, আমার দেহ লোহা বা পাথরের তৈরি নয়, তার উপর অঙ্গ-প্রতঙ্গ চূর্ণ হইয়াছে—শত্রুকে বাধা দিবার বা তাহাকে তাড়া করিবার শক্তি নাই। "নেকড়েগুলোর" বিষাক্ত দংশন থেকে পরিত্রাণ কোথায়? কিন্তু ভগবান এখনো আমাকে ত্যাগ করেন নাই। এই সঙ্কটে নিকটেই একটা হাতাহাতি লড়াইয়ের শব্দ পাইলাম, কিন্তু কোনো অজানা বর্ব্বরের কিরিচের ডগা আমার গায়ে বিঁধিল না। আমার পানে যেই তারা ছুটিয়া আসিল অমনি আমাদের জন পাঁচ ছয় লোক তাদের সঙ্গে লড়িতে সুরু করিল এবং সকলেই মারা পড়িল। আমি নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া কিছুই আশা করি নাই, তবুও আমার প্রাণ দুর্ভাগা সঙ্গীদের প্রাণের মূল্যে রক্ষা পাইল! এইরূপে আমার ক্ষীণ নিশ্বাসপ্রশ্বাস তখনো চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে এক সৈনিক চীৎকার করিয়া মাটির দেওয়ালের উপর লাফাইয়া উঠিল তলোয়ার আস্ফালন করিয়া। কে এই বীর, একাকী শত্রুর খাত দখল করিতে চায়? তার দুঃসাহসে চমক লাগিল। কিন্তু হায়, কোথা থেকে একটা গুলি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল, হুড়মুড় করিয়া সে আমার ডানদিকে পড়িয়া গেল! অতি সহজে অসঙ্কোচে সে মৃত্যুর গহনে প্রবেশ করিল, যেন বাড়ি ফিরিতেছে! মৃত্যুর সন্ধানেই ত সে সেখানে একলা নির্ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়াছিল এবং বিজয়-হুঙ্কারে শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল!

কিছুক্ষণ পরে আমাদেরই সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত গোলা আমাদের মাথার উপরে ঘন ঘন ফাটিতে সুরু করিল। চারিদিকে percussion গোলা—ধোঁয়া ও রক্ত একত্রে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কালো কালো টুকরা টুকরা হাত পা গলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হাল ছাড়িয়া দিয়া চোখ বুজিলাম। কামনা করিতে লাগিলাম—মুহূর্ত্তে আমার দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হোক, অচিরে আমার যন্ত্রণার অবসান হোক! তবুও আমার অস্থিমাংস চূর্ণ করিতে কোনো গোলা আসিল না; আসিল কেবল গোলার ছোট ছোট টুকরা আমার আহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নূতন আঘাত হানিবার জন্য। পাশেই এক আহত সৈনিকের মুখে সেই ভয়ঙ্কর গোলার একটা টুকরা আসিয়া বিঁধিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া সে মরিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে আমিও হয় অমনি এক পরিণাম, নয় অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষুধার্ত্ত কুকুর বা নেকড়ের মুখে যাইবার আশা করিতে লাগিলাম। উত্তরের ভয়ঙ্কর 'ঈগল' আমাকে একটু একটু করিয়া খুঁটিতেছে। মাথার কাছে শুনিলাম কে 'নিপ্পন্ বান্‌জাই'* বলিয়া হাঁকিল। চোখ মেলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিলাম এক হতভাগ্য আহত সেনা। মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গেছে, তবুও স্বদেশের জন্য 'বান্‌জাই' হাঁকিতে ভোলে নাই। সে বারবার 'বান্‌জাই' বলিতে লাগিল, কখনো বা বলিতেছে—এস এস জাপানী সেনাদল! যতক্ষণ না অবসন্ন হইয়া পড়িল ততক্ষণ উন্মাদের মত নাচিয়া কুঁদিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তারপর তার ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়া গেল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—শান্তিতে তার মরণ হোক!

* 'জাপানের জয়'।

ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তে আমার সারাদেহ লালেলাল হইয়া গেছে। কেবল দুই বাহুতে ব্যাণ্ডেজ, বাদবাকি ক্ষত সমস্তই অনাবৃত। কখনো কখনো শান্ত মনে চোখ বুজিতেছি, কখনো চোখ মেলিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিতেছি। বাঁ দিকে দেখি 'উদীয়মান সূর্য্য'-পতাকা উড়িতেছে, তার তলে দুজন জাপানী সেনা মরিয়া পড়িয়া আছে। সম্ভবত পতাকাটি ঐ দুই বীর সৈনিকই সেখানে পুঁতিয়াছে। আমাদের লোকেরা যদি ওদিকে অগ্রসর হয়, তবে শত্রু তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে ; আর রুশেরা যদি ঐ জায়গা পুনরধিকারের চেষ্টা করে, তারাও নিশ্চিত আমাদের গোলন্দাজের হাতে মারা পড়িবে। নির্ভীক সেনাদ্বয় মরিয়াও জায়গাটি দখলে রাখিয়াছে, আর তারা নিশ্চয়ই সফলতার গৌরবে হাসিমুখে তৃপ্তমনে প্রাণ দিয়াছে !

তাহাদের মৃত্যুর মহিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে মন যখন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তখন এক বর্ব্বর নৃশংস কাণ্ড চোখে পড়িল। লক্ষ্য করিতেছিলাম, এক রুশ কর্ম্মচারী বারবার তার আহত পা দেখাইয়া হাতের ইসারায় সাহায্য চাহিতেছে। দেখিলাম, এক জাপানী হাসপাতালের আরদালি, সেও আহত, উক্ত রুশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। আপন ক্ষতের পরিচর্য্যা না করিয়া সে কোমরের থলি থেকে ব্যাণ্ডেজ বার করিয়া সযত্নে রুশের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল ! আহত শত্রুর প্রতি এই দয়ার প্রতিদান রুশ কর্ম্মচারী কিরূপে দিল ? কৃতজ্ঞতার অশ্রুমোচন করিয়া ?—না। করমর্দ্দন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া ?—না। তবে করিল কি ? আরদালির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যেই শেষ হইল অমনি সেই রুশ ইজেরের পকেট থেকে রিভলভার বাহির করিয়া এক গুলিতে সেই জাপানীর প্রাণ সংহার করিল !

নির্ম্মম অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলাম, কিন্তু কিছুই

করিতে পারি না, আমি যে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছি। কেবল চোখ বুজিয়া দাঁত কিড়মিড় করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। মনে হইল প্রাণবায়ু দ্রুতগতি শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কে একজন আমার কোট ধরিয়া আমাকে শূন্যে তুলিল, মিনিট খানেক পরে আবার রাখিয়া দিল। ঈষৎ চোখ খুলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখি দু-তিনজন রুশ পাহাড়ের উপর উঠিয়া যাইতেছে। বন্দী হইতে হইতে বাঁচিয়া গেছি! যে মুহূর্ত্তে আমাকে তুলিয়া ধরিয়া নামাইয়া রাখিল সেই মুহূর্ত্তটি জীবন ও মৃত্যুর, সম্মান ও অপমানের সীমারেখা। হয়ত তারা ভাবিল আমি মরিয়াছি। তেমন ভাবা বিচিত্র নয়, কারণ আমি রক্তে মাখামাখি অবস্থায় ছিলাম।

তারপর কে একজন নিঃশব্দে আমার পাশে ছুটিয়া আসিয়া একটি কথাও না বলিয়া ধূপ করিয়া পড়িয়া গেল। মরিয়াছে না কি? না, মৃত্যুর ভাণ করিতেছে? কিছুক্ষণ পরে সে আমার কানে কানে বলিল—চলুন ফিরে যাই! আমি আপনাকে সাহায্য করবো!

হাঁপাইতেছি, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তারই মাঝে লোকটির পানে তাকাইলাম। অচেনা লোক—একজন সাধারণ সেনা, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

তার সদয় প্রস্তাবের উত্তরে বলিলাম, এ অবস্থায় জীবিত ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব! তুমি বরং আমাকে মেরে ফেলে পার তো নিজে চলে' যাও!

সে বলিল, আমাকে জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার আশা সে রাখে না, তবে অন্ততঃ সে আমার দেহ লইয়া যাইবে—শত্রুর মাঝে ফেলিয়া যাইবে না! এই কথা বলিয়াই সে আমার বাঁ হাত ধরিয়া তার কাঁধের উপর রাখিল। ঠিক সেই সময়ে আমার ডানদিকে যে নির্ভীক

লোকটি পড়িয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ থেকে গোঙাইতেছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, লেফটেন্যাণ্ট, শেসবার আমাকে একটু জল দিয়ে যান! শুনিয়া বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল, আমার সাহায্য-কারীর হাত ছাড়াইয়া তার পাশে পড়িয়া গেলাম। কে জানে, এই দুর্ভাগা হয় ত আমারই দলের লোক, আমাকেই শেস বিদায় দিতে বলিতেছে! আহা বেচারা! হতভাগ্য সঙ্গীকে একলা ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব!

সাহায্যকারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জল আছে তোমার কাছে? সে তার জলের বোতল বার করিয়া আমার বুকের উপর দিয়া ডিঙাইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তির মুখে ঢালিয়া দিল। তখন সে মিনতির ভঙ্গীতে ভাঙা-চোরা হাত দুখানি জোড়া করিল, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—নামু-আমিদা-বুৎসু, নামু-আমিদা-বুৎসু!* বলিতে বলিতে তার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

হত ও আহত অন্যান্য সেনাকে ফেলিয়া বিপদ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু আমার দয়ালু বন্ধু আমার বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া আমাকে পিঠে তুলিয়া লইল, তারপর একলাফে মেটে গড় পার হইয়া গেল। দুজনে ধুপ করিয়া নীচে পড়িলাম। চট্ করিয়া একটা ওভারকোট তুলিয়া লইয়া তার দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া সে নিজে আমার পাশে শুইয়া পড়িল। এইভাবে এক অজানা সেনার পিঠে খাত থেকে মুক্তি লাভ করিলাম। তার পিঠে থাকার সময় গড়ের এক কোণে পা ঠেকিয়া গেল—সেই সর্ব্বপ্রথম ভয়ঙ্কর বেদনা বোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়। সে আবার ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, ঘন ঘন গুলি আসছে, খানিক অপেক্ষা করতে হবে!

---

* বুদ্ধকে প্রণাম করি।

সে থাপ থেকে কিরিচ খুলিয়া লইয়া তোয়ালে দিয়া আমার ভাঙা পায়ে splint-এর মত করিয়া বাঁধিয়া দিল। বিষম তৃষ্ণা—জল খাইতে চাহিলাম। তার বোতলে যেটুকু জল বাকি ছিল সমস্ত দিয়া বলিল, বেশি খাবেন না। প্রায়ই সে আমাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলিতেছিল, বেশি নয়, একটুখানি ধৈর্য্য ধরে' থাকুন! চারিধারে দেখিতেছি অনেক সৈন্য গোঙাইতেছে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার দয়ালু বন্ধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জলের বোতল কুড়াইয়া লইয়া তাদের জল দিতে লাগিল। শত্রুর চোখ এড়াইবার জন্য প্রায়ই সে মরার ভাণ করিয়া চট করিয়া আমার উপর শুইয়া পড়িতেছে।

এখন পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত মানুষটির নাম পর্য্যন্ত জানি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি?

সে ফিসফিস করিয়া বলিল, আমার নাম তাকেসাবুরো কোন্দো।

"কোন্ রেজিমেণ্ট?"

"কোচি রেজিমেণ্ট।"

এই যে সাহসী সেনা আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, এ আমার তাঁবেদারও নয়, আমার রেজিমেণ্টের লোকও নয়—ইহাকে আগে কখনো চোখেও দেখি নাই। অদৃষ্টের এ কোন্ রহস্যময় সূত্রে দুজনে বাঁধা পড়িলাম!

রক্ষা পাইবার কয়েক ঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই মনে পড়িল কোন্দোর প্রিয় নাম।

নির্ভীক তাকেসাবুরো! সেই আমাকে ওয়ান্‌তাইয়ের শত্রু-ব্যূহের বাহিরে আনিয়াছে, কিন্তু জাপানী এলাকায় পৌঁছিতে এখনো দেরি আছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রুশেদের 'মেশিন্-গান' এড়াইয়া ফিরিতে হইবে। লোকটি ত নিজেও আহত! আমার প্রাণরক্ষা হওয়া

অনিশ্চিতেরও বাড়া—আমাকে ফেলিয়া একলা নিরাপদ স্থানে পালাইতে পারিলে তার এমন দুর্ভোগ হইত না। কিন্তু সে পণ করিয়াছে আমাকে সাহায্য করিবে—তার কাছে সে প্রতিজ্ঞার মূল্য আপন প্রাণেরও অধিক। সে সকল বিপদ তুচ্ছ করিল, সকল অসুবিধা সহ্য করিল, অদ্ভুত চতুরতা ও বুদ্ধির সহিত আমার উদ্ধারের জন্য কত রকমের উপায় অবলম্বন করিল, অথচ আমার সঙ্গে ত ব্যক্তিগতভাবে কোনো বাধ্য-বাধকতা তার ছিল না।

কিছুক্ষণ নিজের দেহ দিয়া ঢাকিয়া সে আমাকে রক্ষা করিল। তারপর বলিল, এখনো আমাদের চারিদিকে যথেষ্ট গুলি পড়ছে বটে, তবুও এখানে রাত পর্য্যন্ত থাকা সঙ্গত নয়, কারণ তা হ'লে শত্রু এসে নিশ্চয় আমাদের মেরে ফেলবে! এখনি আমাদের যেতে হবে! ভাবুন আপনি মারা পড়েছেন!

একটি ওভারকোট দিয়া সে আমাকে মুড়িয়া ফেলিল, তারপর নিকটের এক সৈনিককে ইসারায় ডাকিল। আহত লোকটি হামা দিয়া আমার পাশে আসিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই?

সে যে কে আমি তাহা জানিতাম না, কিন্তু সে যখন আমাকে চেনে তখন নিশ্চয়ই আমাদের রেজিমেণ্টের লোক। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, ইস, বেজায় জখম হয়েছেন দেখছি! বলিয়া তাকেসাবুরোর সঙ্গে ফিসফিস করিয়া কথা কহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তারা দুজনে আমাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। ওয়ান্‌তাই পিছনে ফেলিয়া হতাহত সঙ্গীদেরকে ছাড়িয়া একলা চলিয়াছি, সারাক্ষণ সেই লজ্জা কাঁটার মত মনে বিঁধিতে লাগিল। আমার দুই বাহক পাঁচ দশ পা চলে আর শুইয়া পড়ে যেন মারা গিয়াছে! এইরূপে শত্রুর চোখে

ধূলা দেয়। বাহিত হইবার সময় বেদনা বোধ করি নাই, তবে ভাঙা হাড়ের মড়মড়ানি অস্বস্তিকর। কাঁটাতারের বেড়া পার হইয়া, বক্ষপ্রমাণ প্রাচীর পার হইয়া, মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত উগ্র রোদের মাঝ দিয়া বাহিত হইয়া শেষে এক গিরিসঙ্কটে আসিয়া পৌঁছিলাম তারের বেড়ার কিছু নীচে। মনে হইল জায়গাটা চিকুয়ানের পাদদেশ।

সেখানে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নামাইয়া রাখিল। শরীর অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছে, ক্রমে সমস্তই, ঘুমের মধ্যে যেমন, তেমনি আমার চেতনার বাহিরে চলিয়া গেল। অতিরিক্ত রক্তস্রাবই ইহার হেতু। পরে শুনিয়াছি, এই সময়ে আমি মৃত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম। আমার মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে পৌঁছিলে আমার শিক্ষক মুরাই-মহাশয় আমার লেখা একখানি পোষ্টকার্ড বাস্তুপীঠে রাখিয়া আমার আত্মার উদ্দেশে ধুপধুনা ও ফুল নিবেদন করিয়াছিলেন!

গিরিসঙ্কটে কয়েক ঘণ্টা একরকম মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু পরলোকের দ্বার তখনো আমার জন্য খোলে নাই, তাই আবার শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রথম শব্দ যাহা কানে পৌঁছিল তাহা একটা বিকট বিরাট শব্দ—একটা বড় কামানের গোলা আমার কাছে পড়িয়া নুড়ি ও বালি উড়াইল। আমি ধূলায় ঢাকা পড়িলাম।

মনে হইল কামানগর্জ্জন আমার আত্মাকে ইহজগতে ফিরাইয়া আনিল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত স্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। ডান পা'খানা ওরই মধ্যে একটু ভালো, নাড়িবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একটুও নড়িল না। তা থেকে হুহু করিয়া রক্ত বার হইয়া উপরে জমিয়া গেল। দেখিলাম আমার মুখের উপর একখানি সূর্য্য-পতাকা সামিয়ানার মত বিস্তারিত—তাকেসাবুরো কোন্দো তখনো আমার পাশে বসিয়া।

চার-পাঁচ জন আহত সৈনিক আসিয়া পৌঁছিল। যে-ওভারকোটে আমি জড়ানো ছিলাম তাহাতে বাঁশ বাঁধিয়া আমাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে লইয়া যাইবার জন্য সে তাহাদের সাহায্য চাহিল। যে-নিশানে আমার মুখ ঢাকা ছিল তার একটা কোণ তুলিয়া সে বলিল, লেফটেন্যাণ্ট, মনে হচ্ছে আমার আঘাত মারাত্মক নয়, আমি আর ফিরে যাব না। আপনার অবস্থা খুব খারাপ। সাবধানে থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি! এই বলিয়া সে অবশেষে বিদায় লইল। আর তাহাকে দেখি নাই।

তার আশ্চর্য্য সেবা ও সাহসের জন্য তার হাতখানা ধরিয়া তাহাকে কি ধন্যবাদ দিলাম? আমার অচল হাতে তাহা করা সম্ভব হইল না। তার দয়ার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতায় কেবল চোখের জল ফেলিলাম, প্রার্থনা করিলাম—ভগবান ওকে রক্ষা ক'রো! কথায় বলে, একই গাছের ছায়ার ভাগ লইলে, একই জলধারা থেকে তৃষ্ণা মিটাইলে লোকান্তরে মিলন নিশ্চিত হয়! কিন্তু সে স্বেচ্ছায় বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করিয়াছে—আমার এ নবজীবন যথার্থই তারই দান। আমার বর্ত্তমান জীবন মোটেই আমার নয়। ওয়ান্‌তাইয়ে নিঃসন্দেহ আমার মৃত্যু ঘটিত, আমি যে এখন বাঁচিয়া আছি, সে কেবল কোন্দোর অনুগ্রহে। সে কথা যখন ভাবি, তখন দুঃখে কাঁদিতেও পারি না—মনের ভাব কাহাকেও বুঝাইতেও পারি না—কথা আর কান্না দুই-ই কণ্ঠে জমিয়া যায়!

রাত্রে চার পাঁচজন আহত সেনা অন্ধকারের সুযোগে শত্রুর সম্মুখদেশ অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির খুঁজিয়া বাহির করিল। সেখানে যখন পৌঁছিলাম আমি তখনো

অবসন্ন, একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে আছি, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি না। কেবল মনে পড়ে, ওভারকোট ও বাঁশগুলো না খুলিয়াই আমাকে ষ্ট্রেচারের উপর রাখা হইল। ষ্ট্রেচারে বহন করিয়া যেখানে আমাকে নামাইল, সেখানে দেখিলাম লোকেরা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। বাস্তবিক সেইটাই প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির। যেই সে কথা বুঝিতে পারিলাম অমনি বলিয়া ফেলিলাম—সার্জন্ য়্যাসুই এখানে আছেন কি ? আর সার্জন্ আন্দো ?

তখনি জবাব পাইলাম—আমিই আন্দো ! য়্যাসুইও এখানেই আছেন !

সেখানে বন্ধুদের দেখা পাইব আশা করি নাই, কেবল তাদের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম যেন স্বপ্নঘোরে, যে নাম আমার এত প্রিয়। কিন্তু সেই অদ্ভুত রহস্যময় সূত্র যাহা আমাদিগকে বন্ধুত্বে বাঁধিয়াছিল, তাহাই আমাকে সেখানে টানিয়া আনিয়া তাদেরই চিকিৎসাধীনে রাখিয়া দিল ! ছাড়াছাড়ি হওয়া, ছড়াইয়া পড়া যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ বিধি—সেখানে এ ব্যাপার কিছুতেই ঘটানো যাইত না। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিবে, যখন দরকার ঠিক সেই সময়েই তাহাদের দেখা পাইলাম। তাদের অপ্রত্যাশিত গলার আওয়াজ শুনিয়া আমার বুক দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল—সার্জন্ য়্যাসুই ! সার্জন্ আন্দো !

তাহারা আসিয়া আমার হাত ধরিল, কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কহিল—সাবাস ভাই...খুব করেছ !

দেখিতে পাইলাম আমার ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর উয়েমুরার দেহ বামদিকে শায়িত, আর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত সেই নির্ভীক যোদ্ধার দেহ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁর ভৃত্য তারস্বরে কাঁদিতেছে। আমার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শীঘ্রই শেষ হইল। তখন অনিচ্ছায় আমার

তুই ডাক্তার বন্ধুর কাছে বিদায় লইলাম। আমাকে তাহারা পিছনে পাঠাইয়া দিল।

পরে সার্জন্ য়াসুইয়ের মুখে শুনিয়াছি—"যে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে তোমাকে আনিয়াছিল, সেখানে আমাদের দলের আহত সেনা আসিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস ছিল না; তবুও তোমার শুশ্রূষা করা সম্ভব হইল ইহাই সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার। আহতেরা আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা বলিল তুমি নিশ্চয়ই মারা পড়িয়াছ! এমন কি একজন জোর করিয়া বলিল যে, তুমি চিকুয়ানে তারের বেড়ার তলে নিহত হইয়াছ। মানিয়া লইলাম, তোমাকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না। কিন্তু তোমার দেহ উদ্ধার করা চাই, তাই কোন্‌খানে তুমি মারা পড়িয়াছ সে-সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজখবর করিলাম, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পরে সাদাওকা নামে এক সার্জেণ্ট আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তুমি চিকুয়ানের গিরিসঙ্কটে মারা পড়িয়াছ। তখন কয়েকজন আরদালিকে তোমার দেহ ষ্ট্রেচারে আনিবার জন্য পাঠাইলাম। কিন্তু তখন বেজায় অন্ধকার আর শত্রুর গুলিও খুব চলিতেছে, তাই তারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি স্থির হইতে পারি না, কিছু পরে আবার দ্বিতীয় দল আরদালি পাঠাইলাম, তাহারা তোমাকে জীবন্ত ফিরাইয়া আনিল! আমাদের বিস্ময়ও যেমন, আনন্দও তেমনি, কিন্তু প্রথম দর্শনে মনে হইল তোমার আয়ুষ্কাল বড় জোর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সার্জন্ আন্দো ও আমি সদুঃখে পরস্পরের পানে চাহিলাম, তোমাকে বড় হাসপাতালে পাঠাইবার সময় ভাবিলাম সেই আমাদের চিরবিদায় ..

"এই ঘটনার মাসখানেক পরে একদিন আমাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরের সমুখ দিয়া এক সৈনিক শাবল কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে উঁচু পানে মুখ করিয়া পড়িয়া গেল, ছুটিয়া গিয়া দেখি সে তোমারই পরিত্রাতা তাকেসাবুরো। সে আমার বিশেস শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র, কারণ আমি জানিতাম সে-ই তোমাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করিয়াছিল। তখনো মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে, আমার বোতল থেকে তার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম। ঠোঁটে একটু হাসির আভাস দেখিলাম, তারপর মৃত্যু...শান্ত নিরুদ্বেগ !"

এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ঝড় থামিয়াছে! এই শান্তি আসিল অযুত যোদ্ধার রুধিরের স্রোত বাহিয়া। অনাগত যুগে হয় ত এমন সময় আসিবে যখন পোর্ট-আর্থারের সুকঠিন গিরিশ্রেণী ধূলার সঙ্গে মিশিবে, যখন লিয়াওতুঙের নদী শুকাইয়া যাইবে! কিন্তু দেশভক্ত লক্ষ লক্ষ সেনা, যারা সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণ দিল, তাদেরও নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিবে—এমন সময় কখনো আসিতে পারে না! তাদের সে-নামের সৌরভ যুগযুগান্তে ছড়াইয়া পড়িবে, অনাগত জাপানী চিরদিন তাদের গুণগরিমা কৃতজ্ঞ অন্তরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে!

অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকে মন্তব্য লিখিবেন না,
বা, ছবি থাকিলে ছিঁড়িবেন না।

শেষ

## সুরেশবাবুর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "চিত্রবহা"র প্রশংসা

**ভারতবর্ষ**— * * নদী তার উভয় তীরের দৃশ্যাবলী আপন স্রোতের বুকে বহন করে' চলে বলে' তার অপর নাম 'চিত্রবহা'। সুরেশবাবুর উপন্যাসেও জীবনের খরস্রোতা প্রবাহিনী আশপাশের নানা চিত্র বহন করে' তরতর বেগে চলেছে! এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে তাঁর বইয়ের এই নামকরণ সার্থক হয়েছে। তাঁর লেখার ভঙ্গী আমাদের বিশেষ করে' মুগ্ধ করেছে। আর মুগ্ধ করেছে জাপ তরুণী 'ওহানা'। অনবদ্য চিত্র! রচনা-কৌশলে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা যথার্থই উপভোগ্য! বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে ও নানা চরিত্রের মাধুর্য্যে তাঁর এই নূতন উপন্যাস 'চিত্রবহা' এমন একটি অভিনবত্ব বহন করে' চলেছে, যার প্রশংসা না করে' থাকা যায় না। দেশ-দেশান্তরের নর-নারীর নানারূপ এই গ্রন্থে বিবিধ ঘটনার সমাবেশে এমন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে, তারা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী না হয়ে একেবারে রক্তমাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠেছে।

**বিচিত্রা**—সুবৃহৎ উপন্যাস। সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লেখা। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী যে সত্যের আঘাতে জাগিয়াছিল তাহারই একটা দিক কাহিনীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই উদ্দীপনার প্রথম উন্মেষ হইতে আজিকার দাহশেষ অঙ্গার দীপ্তি পর্য্যন্ত, একটি প্রাণশিখার সমগ্র ইতিহাস এই উপন্যাসখানির নানা ঘটনা চরিত্র ও চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নায়ক অমর সেই যুগের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত একটি স্বপ্নাতুর অথচ দৃঢ়চেতা একনিষ্ঠ যুবক। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যত কিছু মিথ্যাচার ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তার সারা প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন জাগিয়াছে, তেমনি সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা তার চেতনায় অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সহজ সরল জীবনযাত্রার আদর্শে উৎসাহিত একটি তরুণ হৃদয়ের স্বাধিকার লাভের আগ্রহ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম, এবং সর্ব্বস্বপণ করিয়াও পরিশেষে পরাজয়ের মধ্যেও

একটি মহিমার আভাস—ইহাই এই উপন্যাসের ভাববস্তু। ভাষা স্বচ্ছ, মার্জ্জিত ও অর্থপূর্ণ—কোনোখানে বাগ্‌বাহুল্য নাই। সংযত ও পরিমিত শব্দবিন্যাসে লেখকের লিখনভঙ্গি একটি অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এই ভাষার দ্বারা রচনার গাঢ়তা উপলব্ধি হয়, এবং তাহা হইতেই লেখকের seriousness ও sincerity পাঠকের মনকে অধিকার করে। উপন্যাসখানি পড়িবার সময় মনে হয়, বাস্তবে ও কল্পনায়, সত্যে ও স্বপ্নে মিশাইয়া লেখক যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি সত্যকার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। * * এই উপন্যাসখানি পাঠক সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এমন একখানি সত্যকার আবেগ, গভীর ভাবনা ও অনুভূতিপূর্ণ উপন্যাস আমরা পাঠ করি নাই। নির্ভীক সত্যবাদ, সর্ব্ব সংস্কার ভেদ করিবার সৎসাহস এবং সর্ব্বোপরি গভীর সহৃদয়তা ও উদার মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে।

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

**উত্তরা—** * * দেশাত্মবোধের এই সন্ধিক্ষণে অমরের সহিত আমাদের পরিচয়। এতদিনের চেনা অথচ অচেনা দেশের সহিত অকস্মাৎ আত্মীয়তায় সে বিস্মিত বিহ্বল—রূপ-বিমুগ্ধ। প্রথম কৈশোরেই সে দেশের ব্যথা বুঝিল, তাই সে ব্যথা নিরসনের চেষ্টা হইল তাহার যৌবনের স্বপ্ন। ভদ্র গৃহস্থের শিক্ষিত সন্তান সে—রূপে-গুণে সে সকলেরই প্রিয়—আবাল্য সুখের মধ্যেই সে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু আত্মসুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও দেশকে সে ভুলে নাই—সে দেশের কথা ভাবে, তর্ক করিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করে, পরের দেশের ইতিহাস পড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। দেশে শিল্পসমৃদ্ধির অভাব দেখিয়া তাহার পুনরুদ্ধার কল্পে সে যৌবন-প্রারম্ভে জাপানে চলিয়া গেল—কত কিছুই সে পড়িল, ভাবিল, শিখিল, ঘোড়ায় চড়িল, বন্দুক ছুঁড়িল, Patrick Henryর মত বুক ফুলাইয়া বলিতে চাহিল "হয় মৃত্যু নয় স্বাধীনতা," কিন্তু কিছুই করিল না—হয় ত করিবার অবকাশ হইল না—মনোমত ক্ষেত্র পাইল না।

* * দেশে ফিরিয়া জাগ্রত বুদ্ধি দিয়া, মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সামান্য কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতেও অমর কোন কিছুকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে

পারিল না। উদ্যম ও কর্ম্মহীনতার ঘূর্ণি হাওয়ায় তাহার কৈশোর-যৌবনের স্বদেশ-স্বাধীনতার কল্পরথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইহাই বুঝি তাহার সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি। যে অনেক কিছুই করিতে পারিত সে কিছুই করিল না—চিত্রের পর চিত্রে অনবদ্য সুন্দর ভাষাপ্রবাহে অমরের জীবনের বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে এই ট্রাজেডি যেন মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

লেখক বলিয়াছেন, 'অমর স্বপ্ন-বিলাসী'—সে কথা সত্য। সে স্বপ্ন-সাধক নহে। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর ইহাই তো মনের চেহারা—এই তো type। তাহার শিক্ষা দীক্ষা, তাহার ভাবচিন্তা, তাহার বোধবুদ্ধি দিবা-স্বপ্নের মত তাহাকে মোহগ্রস্ত করে, উত্তেজিত করে, কিন্তু কল্পনাকে সার্থক করিবার মত শক্তির প্রেরণা জাগাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় না। আত্মপ্রয়োজনের স্বল্পজল খালের মধ্যে লগি বাহিয়া আর গুণ টানিয়া তাহার জীবন ভোর হইয়া যায়। সাধনোচিত কৃচ্ছ্র-সাধনের তাহার না থাকে কর্ম্মশক্তি, না থাকে বিরাট অবসর।

অমরের জীবনেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। প্রেয়সী ও প্রেমময়ী পত্নীকে অসম্মান ও লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইবার জন্য ঘরের মধ্যে মনোমালিন্যে একদিন সে আপনজনের নিকট পর হইয়া গেল—তাহার পর বাঁচিয়া থাকিবার, শুধু দিন যাপন করিবার জন্য প্রাণশক্তির সে কি বিরাট অপচয়, যৌবনশক্তির সে কি মর্ম্মান্তিক পরাভব! দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে কর্ম্মজীবনের রূঢ় অভিঘাতে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের যে অবস্থা—আশা, স্বাস্থ্য, উদ্যম, আনন্দহীন যে নির্জ্জীবতা—অমরের মধ্যে তাহার স্বরূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখ সমরে প্রাণপণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের স্বপ্ন তাহার আর নাই—লটারির বাজি জিতিয়া পরের দাসত্ব হইতে মুক্তিটুকু লাভ করিতে পাইলেই সে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া যায়! এ যেন বিরূপ ভাগ্যদেবতার বিরাট্ ষড়যন্ত্র!

* * কিন্তু সান্ত্বনার তাহার অভাব ছিল কি? সে তো বলিতে পারিত 'all for love and the world well lost'! জীবনের আর যে কোন দিকেই সে বঞ্চিত হউক, নারীর প্রেমে সে কোনদিনই বঞ্চিত হয় নাই—সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে, প্রাণঢালা ভালবাসার অমৃতধারায় তাহার জীবন গৌরবময়, ধন্য।

অতি বিচিত্র এই প্রেমের কাহিনীগুলি—ওহানা ও মাধুরীর নিষ্কলঙ্ক প্রেমের

অবদান বাংলা সাহিত্যের অলঙ্কার। মনে হয় শুধু অমর নহে—গ্রন্থকার সুরেশবাবুও নারীকে ভালবাসেন—তা যেমন বস্তুপরিচ্ছিন্ন নারীত্বকে তেমনই দেহ-মনে-গড়া সজীব নারীকে। তাঁহার 'চিত্রবহা' যেন নারী-চিত্রের একটি চারু ও শোভন কারু-ছত্র। করুণা, ওয়ানা, মাধুরী; কি দরদ ও মমতায় তাহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ত্যাগে প্রেমে জীবনের অপূর্ব্ব মহিমায় তাহারা প্রোজ্জ্বল—পাঠকের কল্পলোকে তাহাদের আসন যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত।

* * প্রকাশের দিক দিয়া সুরেশবাবুর ত্রুটি নাই বলিলেও চলে। তাঁহার ভাষার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না—অলঙ্কারের অভাব নাই, অথচ তাহাতে জড়তা নাই, তাহা যেমন সাবলীল তেমনই স্বচ্ছ। আয়াসের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না অথচ চারিশত পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ গ্রন্থখানি সুরেশবাবুর প্রথম মৌলিক উপন্যাস।

—শ্রীআনন্দসুন্দর ঠাকুর

**Forward**—It is often made a reproach against present-day novelists that they draw so little upon life and so much upon books, that even their frankest realism is realism but not real. Here is a novel which would placate the most thorough-going admirer of sincerity. No attempt is made in it to make pseudo-psychology a substitute for experience of life. It gives the critic an impression that all the feelings and all the scenes which are described in it were felt and seen. It is the story of the tragic life of a young man who suddenly awoke to the existence of his country and his love for it in the glorious dawn of nationalism in 1905, and after many vicissitudes, moral and sentimental, at least found peace, if not fulfilment in the cult of Mahatma Gandhi.

It is the familiar story of many Bengalee lives of our days that it is to be wondered why other novelists have not told it before. Mr. Banerji's treatment of the theme is full of passion yet restrained.

In the Japanese chapters of Mr. Banerji's novel we are full in the midst of the charm and the romance of Japan. Perhaps these scenes too are realistic—Mr. Banerji knows Japan at first hand,—

but, then, even realistic Japan has more attractions than the romances of many other countries.

Romance and idyll, hard and drab reality, passionate idealism with the sordidest experience are entwined in the story. We admire the author's style and live over again many of our own years with the experiences, the aspirations, the disappointments and the joys of Amar—Mr. Banerji's hero.

**নবশক্তি**—'চিত্রবহা'র লেখক শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি আবাল্য শ্রদ্ধা করে' এসেছি তিনি কেবল সুলেখক নয় সত্য লেখক বলে'। তাঁর রচনার সংস্কারমুক্ত নির্ভীক তেজস্বিতা আমাকে বল দেয়। তিনি সেকেলে কিম্বা একেলে কোনো রকম বৈরাগ্যের ধার ধারেন না, কামিনী কাঞ্চনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা বা ব্যাহত তৃষ্ণা নেই, তিনি রাজসিক জীবনের গম্ভীর উপাসক।

অমরের এক একটি স্মৃতি এক একটি চিত্রের মতো; এই স্মৃতি চিত্রগুলির আলবাম হচ্ছে 'চিত্রবহা'। * * তা বলে' কিছু কম চিত্তাকর্ষক হয়নি, বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। * * 'চিত্রবহা' চিত্রবহুলা বটে। * * বইখানিতে চরিত্রও বহু-সংখ্যক ও বিচিত্র। * * এই মানুষগুলিকে একবার চিনলে ভোলা যায় না—এরা সত্যিকারের মানুষ, গল্পের খাতিরে কাল্পনিক নামরূপ পেয়েছে। * * চারশো পাতার একখানি বইতে এতগুলি চরিত্রকে স্পষ্ট করে' ধরা ক্ষমতাসাপেক্ষ। সুরেশ-বাবুর এই ক্ষমতা আমাকে বিস্মিত করেছে। * * এই গ্রন্থটির অংশ বিশেষকে নাকি "অশ্লীল" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই অংশটি যে কোনটি তা আমি অনেক সন্ধান করেও আবিষ্কার করে' উঠতে পারলুম না। * *

'চিত্রবহা'র সব চেয়ে করুণ চিত্র সেই যাতে ওহানা ভরা প্রেমের সংসার থেকে সহসা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, যেন পূর্ণিমার চন্দ্র মধ্য রাত্রিতে আকাশ-সমুদ্রে ডুবে গেল। প্রেমিকা আমার মরে' গেছে কিম্বা প্রেমে ক্লান্ত হয়েছে—এ দুঃখ সহা যায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে কোথাও সে আছে এবং আমাকে পরম ভালোবাসছে, তবু তার ঠিকানাটা জানবার আশা নেই—আমার ঠিকানাও সে জানবে না। যত ভাবি তত আমার হৃদয় হায় হায় করে' ওঠে। হৃদয়বাষ্পে কণ্ঠরোধ হয়। * *

—শ্রীলীলাময় রায়

**শনিবারের চিঠি**— * * সম্প্রতি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' উপন্যাসখানিরও পরিচ্ছেদ বিশেষের বর্ণনাংশ লইয়া এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে।

'চিত্রবহা'য়-অশ্লীলতা আছে—কিন্তু অশ্লীলতার কারণ Criminology বা Sex Psychologyর বিলাস নয়। সমগ্র উপন্যাসখানি যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এই অশ্লীলতার অবতারণায় লেখকের কোনও মন্দ অভিসন্ধি নাই। এক স্থানে লেখক নায়কের বিকাশোন্মুখ যৌবনের একটা স্বভাবধর্ম্ম চিত্রিত করিয়াছেন। সমগ্র উপন্যাসখানির inspirationএ ইহার একটা প্রয়োজন আছে। * * লেখক মানব-জীবনের ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিৎ সকল দিকের মধ্য দিয়া একটা চরিত্রের বিকাশ ও জীবনের পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে যদি কেহ সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করেন তবে কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহার সর্ব্বাংশের একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। কু ও সু দুই মিলিয়া একটি অখণ্ড রাগিনীর সৃষ্টি করে, তাহা moralও নয়, immoralও নয়—আরও বড়, আরও রহস্যময়। * * কিন্তু যেখানে সমগ্রতার কল্পনা নাই, সেখানে কোনও একটা দিক বা অংশ বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়, এজন্য সু-ই হোক আর কু-ই হোক, শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক, তাহা উপাদেয় নয়। সুরেশবাবুর বই সকলে সবটা পড়েন নাই, কিন্তু সাহিত্যরসিক মাত্রেই Jean Christophe পড়িয়া থাকিবেন। Jean Christophe কি অশ্লীল? তাহা হইলে 'চিত্রবহা'ও অশ্লীল। * * কিন্তু এই অশ্লীলতা ও দুর্নীতি এক নহে, এ কথা কেহই ভাবেন না। 'চিত্রবহা' উপন্যাসখানি পাঠ করিলে অন্ততঃ এ সন্দেহ ঘুচিবে। * *

—'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধ

**Amrita Bazar Patrika**—"Chitravaha" is a distinguished work of art. It fully maintains Mr. Banerji's reputation as a writer of rare charm and insight...the story portrays ever-changing many-coloured life in a series of fascinating pen-pictures...the unforgetable days of Swadeshi...surprisingly come to life at the touch of the gifted author's pen...Some of the chapters of the book dealing with our hero's life in Japan are of surpassing elegance depicting Amar's romantic life and love in the Land of the Rising Sun...